Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 2	Place of Publication: Sundaram Prakashani, 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.
Collection: Indrajit Chaudhury, A.B.P. House, Kolkata / Ashok Sen, 98 S. P. Mukherjee Rd.; Kolkata:700028	Publisher: Subho Thakur.
Title: *Sundaram* (Bengali monthly art magazine)	Year of Publication: Year 1, No.1, *Sravana*, 1363 B.S (1956) – Year 4, No. 3 - 12, 1367 B.S. (1960).
	Size (l. x b.): 23c.m. x 17c.m.
Editor: Subho Thakur (03. 01. 1912 – 17. 07. 1985).	Condition: O.K. / Good. Cover page of *Sundaram* 2nd yr, no. 3 is partially torn.
	Remarks: Single volumes with advertisements; Sequence of page numbers may break as cover pages, title pages, content lists are not included in the numbered pages of the book.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

সুন্দরম্

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

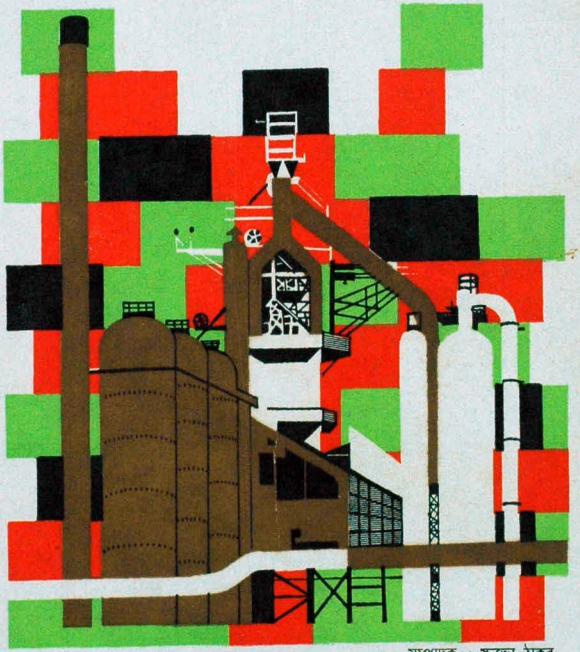

প্রচ্ছদ চিত্র : শিল্পী ও. সি. গাঙ্গুলী অঙ্কিত ইস্পাত চুল্লী।

সম্পাদক : সুভো ঠাকুর

লেখক ও লেখা

মৈত্রেয়ী দেবী
দিলীপ মিত্র
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত
সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলকণ্ঠ
পার্থপ্রতিম চৌধুরী

রবীন্দ্রচিত্রপ্রদর্শনী
আলোর কান্না
ইস্পাতের আলপনা
সঙ্গীতপ্রেমী রবিশঙ্কর
চিত্র ও বিচিত্র
সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র

এই বিশেষ সংখ্যা টির দাম দু টাকা

বিস্কুট
লজেন্স
এবারে
কোলে
টফি ডি লুক্স
দুধ ও মাখন দিয়ে তৈরী
সুমধুর স্বাদে এমনটী আর হয়নি
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ · কলিকাতা-১০

আকাশে বাতাসে আজ যে
উৎসবের আবাহন তারই বারতা
বয়ে এনে মার্ফি আপনার
নিভৃত গৃহকোণকে সঙ্গীতময়
করে তুলুক।
murphy radio
পূর্ব ভারতের একমাত্র পরিবেশক
দেবসনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
২, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
ফ্রেজার রোড, চাঁদনি চক্, পাটনা-১
DPAI7-60

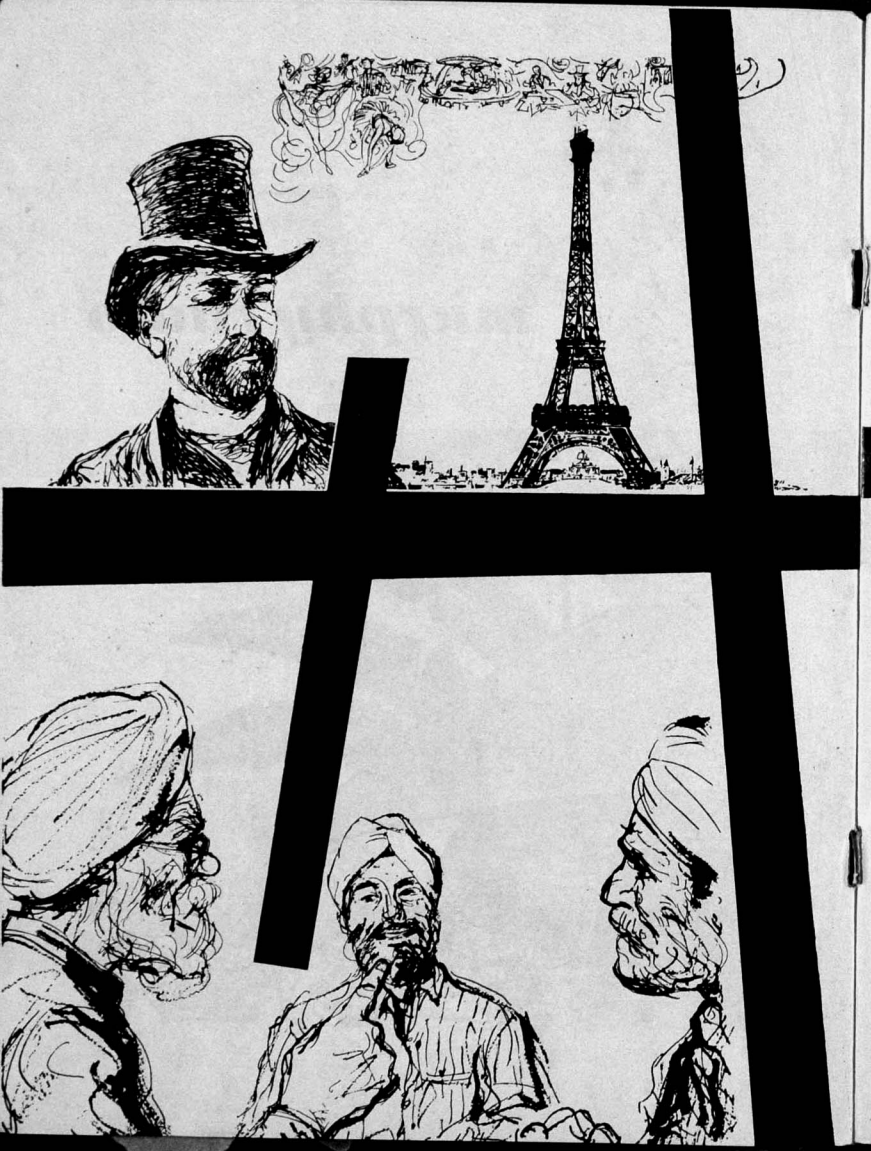

টাটা স্টীল-এর বিজ্ঞাপনের
জন্য আঁকা
রণেন আয়ন দত্তের
চারটি স্কেচ

দি টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেড

don't neglect
brassware—
it's so easy to shine
Dirty, tarnished brassware makes a home look dull and neglected. Don't let this happen in your home. A few drops of Brasso and a quick rub will bring out the natural brightness and beauty of the many brass articles that you have around the house. Polish regularly with Brasso, and recapture the forgotten highlights of your brassware. Brasso is easy to use and very economical.
polish your brassware with
BRASSO
once a week, every week
ATLANTIS (EAST) LIMITED (Incorporated in England)
TBA 4232

সৌন্দর্যের
সাধনায়
রূপসী রমণী মাত্রেই জানেন যে নির্ভরযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহারই সৌন্দর্য রক্ষা ও কমনীয়তা বৃদ্ধির সহায়তা করে।
অঙ্গরাগের জন্য
বিশিষ্ট প্রসাধনী
প্রিয়া স্নো
ত্বক কোমল ও নির্মল রাখে
Priya Snow
উষসী ফেস পাউডার
অভিজাত প্রসাধন রেণু
প্রিয়া সেন্ট্
অনবদ্য পুষ্পসার
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা * বোম্বাই * কানপুর

হাল্কা ! ঝকঝকে ! পরিষ্কার !

'অ্যালকাথিন'এ তৈরী রঙিন ঘরকন্নার জিনিসপত্র

-ভাঙে না

অ্যালকাথিনে তৈরী ঘরকন্নার জিনিসপত্র আপনার বাড়ি রঙে রঙে মনোরম করে তুলবে; হাল্কা অথচ মজবুত বাজারের থলেতে রাজ্যের বাজার আপনি বয়ে আনতে পারবেন; সুদৃশ্য 'ডয়লি' আপনার টেবিলে একটুও দাগ বা আঁচড় লাগতে দেবে না; বিশেষভাবে তৈরী রেফ্রিজারেটরের বোতল একেবারে ঠিক মাপ মতো ব'সে যাবে; আর বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে চৌকো টিফিন বাক্সগুলি।

মনে রাখবেন:
অ্যালকাথিন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ।
'অ্যালকাথিন' সাবান ও অল্প গরম জলে পরিষ্কার করতে হবে।

শিশুদের জন্য বেল্ট, মালা আর খেলনাও পাওয়া যায়!

'অ্যালকাথিন' হচ্ছে আই-সি-আই মার্কা পলিথিন

ICI 1ST IN THE WORLD IN INDIA
I.C.I. DISCOVERED POLYTHENE, AND I.C.I.'s SUBSIDIARY, THE ALKALI & CHEMICAL CORPORATION OF INDIA LTD., ARE THE FIRST TO MAKE POLYTHENE IN INDIA

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ নয়া দিল্লী

IPC-68 BEN

তারপর একদিন ...

বাবার হাতের গাঁইতি খানাও ওর কাছে খেলনা। ইস্পাতের ঐ গাঁইতি খানার সাথে বাবার শক্ত হাত দুটোর সম্পর্কের কথা ওর জানা নেই। বাবার মতো বাবা সেজে ও খেলা করে। টেলিগ্রাফের ঐ টানা টানা তারগুলো ওর কাছে এক বিস্ময়, আরও বিস্ময় তারের ঐ গুণগুণানি। কিন্তু আজ ও যে শিশু...
তারপর একদিন ঐ শিশুই হয়ে উঠবে দেশের এক দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক। কর্ত্তব্য আর কর্ম্ম হবে ওর জীবনের অঙ্গ; ছেলেবেলার সব খেলাই সেদিন কর্ম্মে রূপান্তরিত হবে। জীবনে আসবে ওর বোধন আর চেষ্টা। মহৎ কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শ্রান্তিময়, ক্লান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে। বৈচিত্র আর অভিনবত্ব জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টাএগিয়ে চলেছে আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও ... দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

PR.3-X52 BG

ATTRACTIVE PACKAGING SELLS YOUR PRODUCT

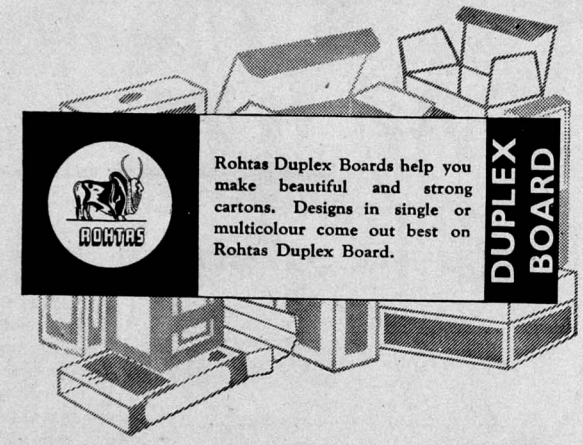

SAHU JAIN INDUSTRIES

ROHTAS INDUSTRIES LTD.
Dalmianagar, Bihar

LARGEST PRODUCERS OF PAPERS AND BOARDS IN THE COUNTRY

নতুন
জীবনের
নতুন
দাবী

পূরণ করতে নবজাতকের
জননীকে পুষ্টিকর
টনিকের ওপর নির্ভর
করতে হয়।
সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ
ভাইনো-মল্ট
ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায়
সাহায্য করে
এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি
ফিরিয়ে আনে।

ভাইনো-মল্ট

OBL

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা - ১৩

ক্লিওপেট্রা ও কেতকী

ক্লিওপেট্রার ঘন চিকণ কেশগুচ্ছের মূলে ছিল **অলিভ অয়েলের** নিত্য ব্যবহার। একালের কেতকীও জানেন যে, কেশবর্ধনে সহায়ক বলে সুবিদিত **অলিভ অয়েল** এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তৈলের সংমিশ্রণে প্রস্তুত ক্যালকেমিকোর **ক্যান্থারল** কেশতৈল কেশবর্ধনে অপরিহার্য।

ক্যান্থারল

অলিভ অয়েল সংমিশ্রণে প্রস্তুত
একমাত্র সুগন্ধি ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড কলিকাতা-২৯

অব্যাহত গতি

একদা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখকের খোঁজ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্তে রাজি হইলেন যে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।

আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে তাঁদের লেখার গতি কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই **সুলেখা** আজ এত জনপ্রিয়।

(GENERAL)
SOL'S-50'

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

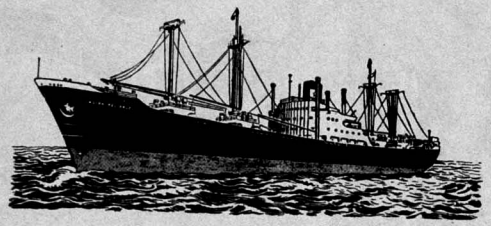

ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোম্পানী লিঃ

ভারত-যুক্তরাজ্য-কন্টিনেণ্ট সার্ভিস

আমাদের বিদেশগামী জাহাজগুলি ভারতবর্ষ হইতে পোর্ট সুদান, পোর্ট সৈয়দ, লণ্ডন, লিভারপুল, ডাণ্ডী, এণ্টওয়ার্প, রটারডাম, হামবুর্গ, ব্রেমেন ও অপরাপর ইউরোপীয় বন্দরগুলিতে নিয়মিত মাল বহন করে।

ভারতের উপকূল বন্দরেও যাতায়াত করে

আপনার সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়া জাতীয় বাণিজ্য-বহরকে শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

লায়োনেল এডওয়ার্ডস্ (প্রাইভেট) লিঃ

"ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ হাউস"

২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১

ফোন : ২৩ - ১১৭১ (৮টি লাইন)

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে টেঁকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিঃ

২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা - ১২

Courtesy
Speed
Efficiency

that's
Burmah-Shell
Service!

The friendly smile...the helpful gesture...these and many other small but important signs of personal service show that you are a welcome and valuable customer whenever you come to a Burmah-Shell Station.

"Oil check, madam?...and how about the battery?"

"There's water in the radiator and the correct air pressure in your tyres." Nothing is overlooked. The needs of your car have been met... quietly, efficiently without fuss or bother.

We know that nine times out of ten, you're in a hurry. The motorist is a busy person. That's why our Dealer's staff is trained to attend to your car effectively and speedily, in a systematic manner.

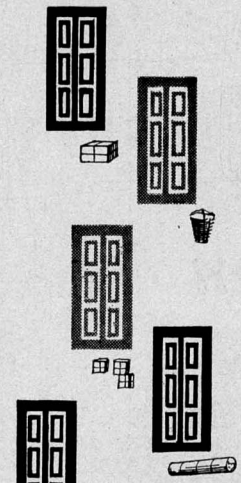

বাড়ী থেকে মাল আনা, আবার পৌঁছে দেওয়া

আপনি জানেন কি, যে ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১লা তারিখ থেকে কলকাতায় দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের পক্ষ থেকে, বাড়ী থেকে মালপত্র সংগ্রহ করা এবং বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে।

প্রচলিত ভাড়ার ওপরে সামান্য কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিলেই আপনিও এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

এই রেলপথের অনুমোদিত প্রতিনিধি—শ্রীবাচরাজ আগরওয়ালা, ১৭, কাশীনাথ মল্লিক লেন, রুম নং ২২, কলকাতা-৭ এই ঠিকানায় অথবা হাওড়া ষ্টেশনে তাঁর ভার-প্রাপ্ত কর্মচারীকে মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে একটু লিখে জানালেই সমস্ত ব্যবস্থার সুবিধা আপনার জন্যে তৈরী থাকবে।

এই ব্যবস্থায় মালপত্র সংগ্রহ করা হবে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৩টে পর্য্যন্ত, আর মালপত্র পৌঁছে দেওয়া হবে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৬টা পর্য্যন্ত, রবিবার ছাড়া প্রতিদিন। অবশ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে এমন জিনিষের বেলায় রবিবারেও মাল পৌঁছে দেওয়া হবে।

ঘরে ঘরে মালপত্র দেওয়া নেওয়ার সুযোগ আপনি বা নেবেন না কেন?

বিশদ বিবরণের জন্য
১। চীফ পার্সেলস এণ্ড লাগেজ ইন্সপেক্টর (পার্সেলস ট্রাফিক), হাওড়া (ফোন ৬৬-৩৪১১, এক্সটেনশন-২)
২। চীফ কমার্শিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিস, রোড ট্রান্সপোর্ট সেক্সন, রফি ষ্টেডিয়াম, ইডেন গার্ডেনস, কলিকাতা-২১ (ফোন ২৩-২৯৩৬)

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

Let your Savings g·r·o·w

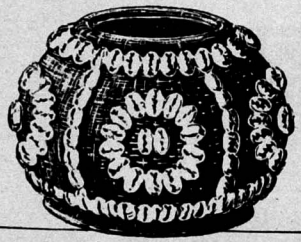

with
United Bank of India Ltd.

HEAD OFFICE: 4, CLIVE GHAT STREET, CALCUTTA-1

UBI-1-57

আমাদের হস্তশিল্প—সূচীশিল্প

সূচীশিল্পীর—শিল্পকলা একটু বিলাসিতার ছোঁয়া দিয়ে আমাদের গৃহকে রমনীয় করে তোলে। আমরা সকলেই এইটুকু বিলাসী হতে পারি।

আমাদের দেশের সূচীশিল্পীগণের নিপুণ অঙ্গুলীর যাদুস্পর্শে সামান্য পুঁতির মালা, শঙ্খ, পালক এবং কাঁচ নতুন রূপ নেয় এবং যে কোন জিনিষকে সুন্দরতর করে তোলে।

ভারতীয় সূচীশিল্প দিয়ে আপনার গৃহ সুশোভিত করুন।

নিখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ড
ভারত সরকার

DA 12/656

চিত্রদর্শন • কানাই সামন্ত

যুগান্তর সম্পাদকীয় বলেছেন, ..."ইহাতে শিল্পের প্রাণবস্তুর স্বরূপ ও ভারতীয় শিল্প-শৈলীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া সেই পটভূমিতে সুধী গ্রন্থকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র-নাথ ও নন্দলালের শিল্পকীর্তির বিশদালোচনা করিয়াছেন। ...তাঁহার বিষয় সমাবেশ ও আলোচনার সামগ্রীকতা প্রামানিকতা এবং প্রাঞ্জল লিপিকুশলতা কাহারো নজর এড়াইবে না। ...ঈষদূন অর্ধশত পূর্ণপৃষ্ঠা একরঙা ও বহুরঙা ছবি বইটিকে এমন একটি অমুল্য চিত্রশালার রূপ দিয়াছে, যাহার পাশে দাঁড় করাইবার মতো দ্বিতীয় কোন বাংলা বইয়ের কথা অতি-পড়ুয়ারও সহসা মনে পড়িবে না। অজন্তা-এলোরা তাঞ্জোর কাংড়া হইতে বীরভূম কালীঘাট পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্কুলের চিত্রনিদর্শন যেমন ইহাতে স্থান পাইয়াছে, তেমনি পাইয়াছে ঠাকুরবৃন্দের এবং অবনীন্দ্র, নন্দলাল গোষ্ঠীর বিশিষ্ট শিল্পীদের মুখ্য সৃষ্টিগুলিও। ...বইটির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার মনোরম চিত্র-লেখাগুলির নিখুঁত মুদ্রণ। ...ভারতীয় চিত্রকলার রূপদর্শনের এবং আধুনিক শিল্পশৈলীর অগ্রযাত্রায় ব্যংলার দান কি ও কতটা তাহার পথনির্দেশক হিসাবে এই সুন্দর বইটিকে আমরা সাদর স্বাগত জানাইতেছি।"

প্রখ্যাত শিল্প-সম্যলোচক...শ্রীঅজিত ঘোষ

অমৃতবাজার পত্রিকায় বলেছেন, "...We now welcmoe Sri Kanai Samanta who has achieved yet another landmark by his 'Chitradarshan' and has even improved on the work of his esteemed predecessor...The contents...bear the stamp of a thoughtful and discerning mind, of wide reading and complete grasp of each subject dealt with. And what is very important in books of this class it is written in a very attractive and entertaining style so that the reader's interest never flags..."

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ

৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা-৯

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড্-এর গ্রন্থতিথি

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নুতন বই প্রকাশিত হয়।

৭ই আশ্বিন ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষে বন্ধ থাকার দরুন একসঙ্গে ৭ই ভাদ্র ও ৭ই আশ্বিনের বই বাহির হইল।

চিত্রিতা দেবীর উপন্যাস **দুই নদীর তীরে** ৬·৭৫

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের **চতুষ্কোণ** ৩·২৫

দিলীপকুমার রায়ের **স্মৃতিচারণ** ১২·০০

ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্যের **বাংলা কাব্যে শিব** ১০·০০

পূজায় ছোটদের ৭ খানি নূতন বই

লীলা মজুমদারের **বকধার্ম্মিক** ১·৭৫

শৈলেন্দ্র বিশ্বাসের **বাল্মীকি-রামায়ণ** ২·৫০

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর **হাস্নূহানা** ২·৫০

সুখলতা রাও-এর **নানান গল্প** ২·৫০

শৈল চক্রবর্ত্তীর **ছোটদের ক্র্যাফ্‌ট** ২·৫০

সুধীর সরকারের **বোমা** ২·৫০

হেমেন্দ্র কুমার রায়ের **চল গল্প-নিকেতনে** ২·৫০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং

প্রাইভেট লিমিটেড

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড্, কলিকাতা

সকল উৎসব সর্বকালীন সুন্দর ও মধুর
করে তোলা শিল্পে

শুধুই

কমলালয় ষ্টোর্স

প্রাইভেট লিমিটেড

সর্ববৃহৎ বিভাগীয় বিপনি

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : : কলিকাতা-১৩

সুন্দরম্

আগামী সংখ্যা

সুন্দরম্-এর

- বিরাট বিশেষ সংখ্যা -

লেখা ও ছবিতে

অনতিপূর্ব

হোয়ে

শিগ্রই প্রকাশিত

হোচ্ছে

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর

প্রথম প্রবন্ধ

রাষ্ট্র শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে।

প্রায় দুশো খানা ছবি সহ।

★

মূল্য তিন টাকা

অগ্রিম অর্ডার বুক করুন।

নতুবা না-পাওয়ার সম্ভাবনা।

পরিজা ব্রাদার্স

কলেজ ষ্ট্রিট

OPM-240

সর্বে সুখিনঃ সন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ভবেত্॥

সুখী হোক সবে—হোক সবে নিরাময়
সকলেই যেন সুন্দর দেখে দুঃখকে করে জয়

ওরিয়েণ্ট পেপার মিলস্ লিঃ

ব্রজরাজ নগর, উড়িষ্যা

(ম্যানেজিং এজেণ্ট) বিরলা ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড

'নীলরক্ত লাল হয়ে গেছে' এবং 'আলাত চক্র'-র পর

সুভো ঠাকুরের রসমেদুর চিত্রোপন্যাস

সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা প্রথম পর্ব

দাম : সাড়ে চার টাকা

সবে বেরুলো

সপ্তদ্বীপ পরিক্রমার চরিত্র-চিত্রণের বিচিত্র মিছিলে যোগদান করেছেন :

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
সত্য দত্ত
বন্ধুত্তম
অরুণ ব্যানার্জ্জি
নরেন দত্ত
ভূপাল দত্ত
প্রসাদ সিংহ
বিরাম মুখার্জ্জি
৺বঙ্কিম মুখার্জ্জি
নাটুমহারাজ
সারদা দাশ
আরতি ঠাকুর
ভূপৎ সিং
মাণিক মুখার্জ্জি
আনন ঘোষাল
সুশীল গুপ্ত
প্রফুল্ল মিত্র
মিনতি দেবী
শঙ্কর হালদার
লিনা
অনুরাধা

রহমান সাহেব
কে. পি. সিং
সুদেব ভট্টাচারিয়া
কেকু গান্ধি
মনিষী দে
অমল মিত্র
টুকু
বিল্লি দেবী
পুষি দেবী
নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য
হেনা মা
দেবু চৌধুরী
হিতু চৌধুরী
মিতুল ঘটক
জলি বড়ুয়া
চিত্রা বড়ুয়া
অনসূয়া দেবী
কুমার সরদিন্দু সিংহ
বসির সাহেব
আনন্দ স্বামী
যোগনাথ চ্যাটার্জ্জি

স্যার কারয়াসজি জাহাঙ্গীর
আয়াজ পীরভয়
টুক্ টুক্ রণবীর সিং
বিঠলভাই জাভেরি
সুমতি মোরারজি
মুলুক রাজ আনন্দ
লাইডেন
ল্যাংহামার
শ্লেজিঙ্গার
আরা
গাডে
গাইতোণ্ডে
কুলকারনি
হুসেন
সামন্ত
এবং
এবং
এবং

● এঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো আপনাদের চেনা।

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড—৯, রায় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ফোন : ৫৫-৩১৪৮

সুন্দরম্। চতুর্থ বর্ষ। তেরোশো সাতষট্টি। তৃতীয়-দ্বাদশ সংখ্যা

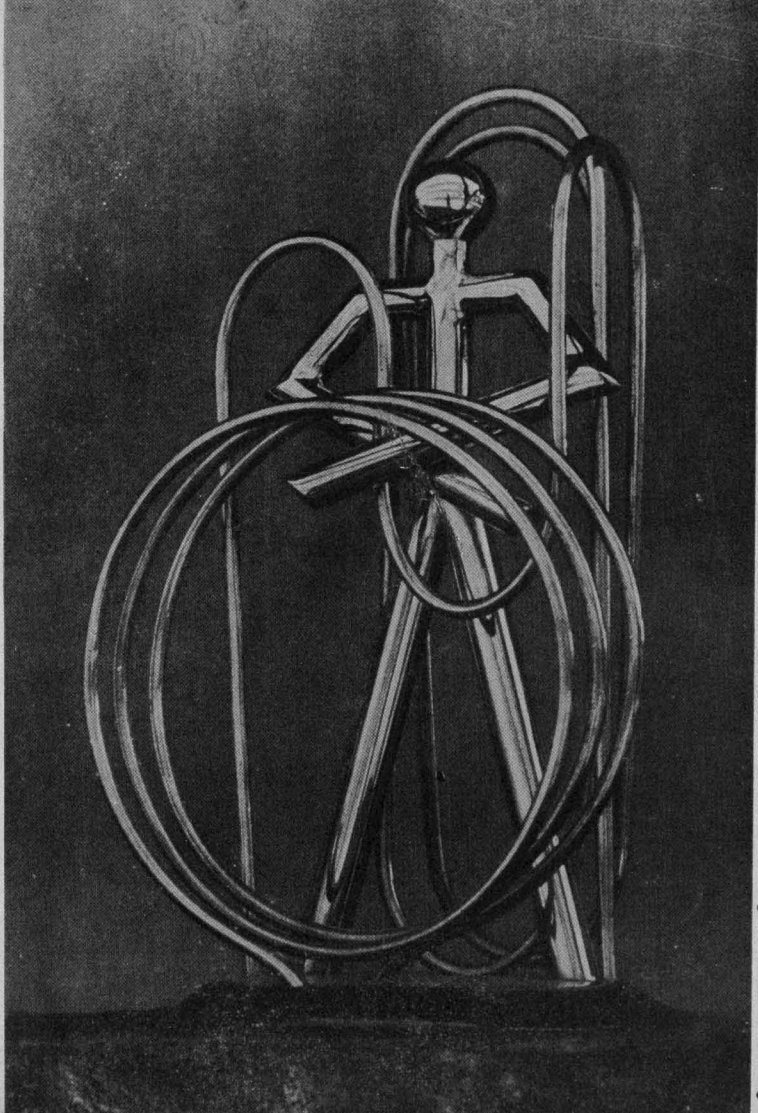

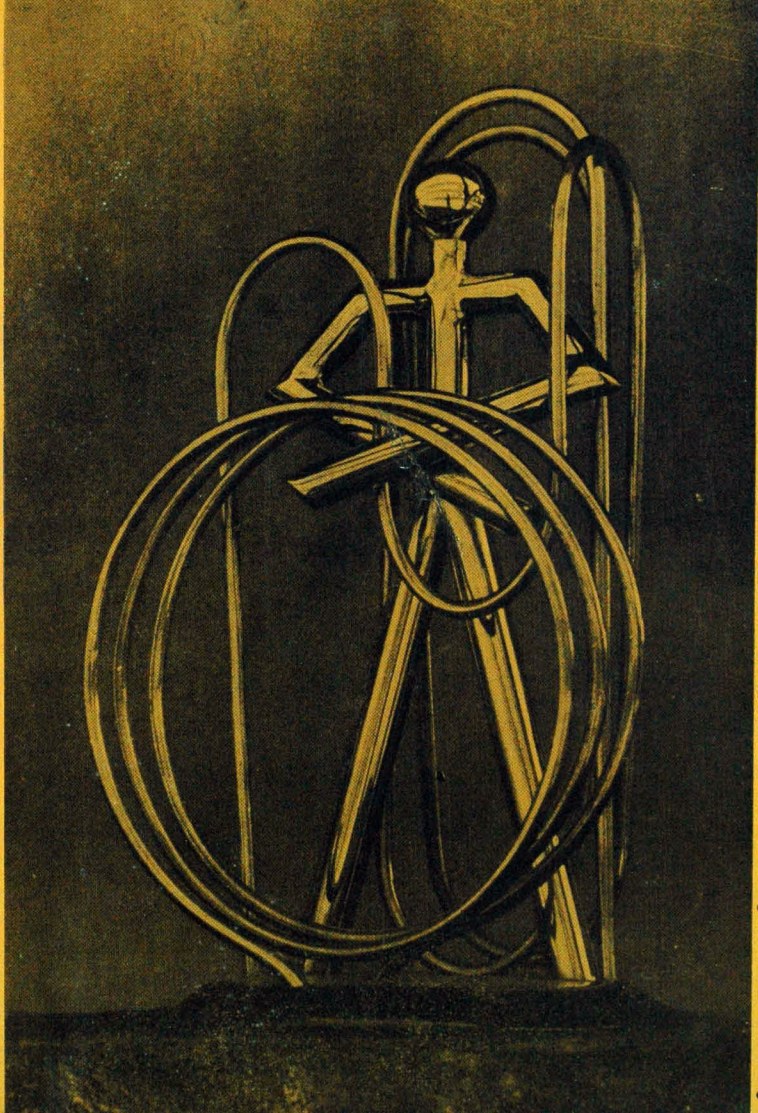

সুন্দরম্। চতুর্থবর্ষ। তেরোশো সাতষট্টি। তৃতীয়-দ্বাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়	সুভো ঠাকুর
বিদেশে রবীন্দ্রচিত্র প্রদর্শনী	মৈত্রেয়ী দেবী
সম্পাদকীয়। দ্বিতীয় দফা	সুভো ঠাকুর
মাসিক পত্রের কথা	বুদ্ধদেব বসু
আলোর কান্না	দিলীপ মিত্র
ইস্পাতের আলপনা	কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত
গ্রন্থজগত	গ্রন্থকীট। শুভেন্দু ঘোষ
সঙ্গীতপ্রেমী রবিশঙ্কর	সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্র ও বিচিত্র	নীলকণ্ঠ
সাম্প্রতিক কালের চলচ্চিত্র	পার্থপ্রতিম চৌধুরী
খবরা খবর	প্রভাত গুহরায়। অজিত পাইন

অঙ্গসজ্জা : **রণেন আয়ন দত্ত**

সম্পাদকীয়

এই সেদিন, সুন্দরম্ সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় ব্যাঙ্গালোরে শ্রেষ্ঠ পত্রিকা হিসেবে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু এই পুরস্কার পাওয়ায় সুভো ঠাকুরের দুস্তর লজ্জা—দস্তুরমত লক্ষণীয়! ও' বলে—সাহিত্যিকরা পুরস্কারের জাত মেরে দিয়েছে। 'মেডেল' আজকাল—ঘুঁটের মেডেল-এর সামিল! 'সীল্ড' আজকাল—পিচবোর্ড আর রাঙতায় তৈরী! এমন কি 'পুরস্কার-এর পাওয়া টাকা ইস্তক—পোড়ে পাই চোদ্দ আনা দালালীর নামান্তর মাত্র!

'পুরস্কার'—তা সরকারী আকাদেমী অথবা রবীন্দ্রনাথ যার নামেই হোক না কেন, আজ শ্রদ্ধা আনয়নে নিতান্তই অক্ষম। এবং, এর জন্যে দায়ী যে কারা—তা আজ কারো অবিদিত না থাকায় পুনশ্চ উল্লেখ অনাবশ্যকীয়।

তাই আজ পুরস্কার প্রাপ্তিরূপ এ হেন সম্মানে সুন্দরম্ ও তৎসম্পাদক সুভো ঠাকুর—নেহাতই ভাগ্যের বিড়ম্বনা যার উপর মানুষের করণীয় কিছু নেই—এই বোলে, হাল ছেড়ে গ্রহণ কোরলেও আদতে মুদ্রক লালচাঁদ রায় এন্ড কোম্পানীর এইরূপ সাফলো এবং কৃতকার্যতায় ও' আন্তরিক আনন্দিতই শুধু নয় অধিকতর উৎসাহ প্রকাশেরও প্রয়াসী।

যাই-হোক, এদিকে কিন্তু চারিধারে কলরব উঠেছে—সুভো ঠাকুর যথেচ্ছাচারে উদ্যত! হাতে তরোয়াল পেয়ে এলোপাথাড়ি যেখানে সেখানে কোপ মারতে বোসেছে। কাগজ হাতে থাকলেই যদি তাই নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যেতো—তাহলে তো কথাই ছিলো না। 'বাজার' মার্কা কাগজের কথা বাদ দাও, কলাবিষয়ক মাসিক পত্রিকা সুন্দরম্-এর 'ইস্পাত সংখ্যা' কি করে সম্ভব?

অথচ এই সুন্দরম্-এর 'ইস্পাত সংখ্যা'রূপ বিশেষ-সংখ্যার তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে দমে যাওয়া তো দূরের কথা, সুভো ঠাকুর দস্তুর মতো উৎসাহিত হয়ে ওঠে, উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

ওর মতে দক্ষিণের চোল পিরিয়ড-এর ধাতব নারী-মূর্তির পীনোন্নত পয়োধর হোতে এ-যুগের ইস্পাতের একটি পিনিয়নের সুগঠিত অবয়ব—গঠনের দিক দিয়ে বিচার কোরলে আকর্ষণে কোনো অংশে কম যায় না। বৌদ্ধযুগের বিরাট চৈত্য আর এ-যুগের লোহা গালাবার আধুনিকতম সুবিশাল চুল্লীর যন্ত্রময় ধাতব চেহারা—চোখের কাছে চমৎকারিত্বের দিক দিয়ে কোনো অংশে খাটো হোতে যাবে কেন?

এই সকল ধাতব যন্ত্রের তাবত জমাট রূপমাধুর্য—বহুদিন যাবত সুভো ঠাকুরের নয়নদ্বয়কে অনিবার্য আকর্ষণে আকর্ষিত করার নিয়তই সুযোগদানে ধন্য। এ ছাড়া, কিছুদিন আগে অবধি—অর্থাৎ এই সে-দিনও দেশীয় শিল্পীদের বিরুদ্ধে একটি নালিশ নিতাই ধূমায়িত হোতে দেখা গিয়েছিল, সেটি হচ্ছে—তাঁদের অঙ্কনের বিষয়বস্তু এবং ভাবাদর্শ সন্ধানে সবসময় তাঁরা অতীতের পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক ঘটনার অলিগলিতে ঘোরা-ফেরা করতে সহজ ও স্বচ্ছন্দগতি। ঐ সকল শিল্পীদের সকল ফুরসৎ ফুৎকারে পরিসমাপ্তি পায় একমাত্র ঐরূপ সৃষ্টির অলিন্দের আনাচেকানাচে পরিক্রমণাতে।

সুন্দরম্-এর 'ইস্পাত সংখ্যা' এ-যুগের শিল্পীদের ঐরূপ দুর্নাম খন্ডাতে একটি অখন্ড খান্ডবদাহন-বিশেষ। যা অচিরাৎ এ-যুগের শিল্পীদের প্রতি

উল্লেখিত অবিচার করাকে নিমেষে নস্যাৎ করার একটি অমোঘ অস্ত্র হিসেবে ধরলেও অন্যায় হবে না।

সত্যি এ-যুগের শিল্পীদের কাজে এ-যুগের ছাপ নেই —এই আক্ষেপ বহুদিন ধোরে শুনে আসা হোচ্ছে!

যে যুগে ক্ষেপণ যন্ত্র চন্দ্রলোকে পাকসাট মেরে ধাবমান, যে যুগে তিমিরবিদারী তিমি মাছের মত দেখতে হেডলাইট-জ্বালা মোটরগুলো বর্তমানের সকল অন্ধকারকে আঁৎকে তুলে নিত্য-নতুনরূপে ভবিষ্যতের অজানা রহস্যের পানে ঊর্ধ্বশ্বাসে আগুয়ান, যে যুগে লাভেন্ডারের শিশির মত শাড়ী জড়ানো নারীদেহের লাবণ্য নিতুই নতুন ভঙ্গিমায় নিয়তই চোখে খোঁচা মেরে নির্লজ্জের মত নজরে নামে আর ওঠে—তবু সে যুগে—শিল্পীরা অতীতের গণ্ডোগ্রাফীর হিমশীতলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হোয়ে—বর্তমান তথা ভবিষ্যতের উত্তাপময় উচ্ছলতা উপেক্ষা কোরে তেমনতর সাড়া দিতে নারাজ হোয়ে কেন? বর্তমানের ঘাতপ্রতিঘাতের বিচিত্র প্রকম্পনে নাড়া খেতে নেহাতই যেন গররাজি এবং পিছপা।

এ যুগের দেশীয় শিল্পীরা লাভেন্ডারের শিশির সঙ্গে তুলনীয় আধুনিক নারীদেহের লাবণ্যের ফাঁদে কদাচ ভবিষ্যতে পা বাড়াবেন কিনা এখনও সঠিক জানা না গেলেও, ইতিমধ্যে তাঁরা যে ইস্পাতের আলপনায়, যন্ত্রের মন্ত্রণায় উচ্চকিত হোয়ে ময়দানবের জয়গানে মুখরিত—এবিষয় সুন্দরম্-এর এই 'ইস্পাত সংখ্যা' অবলোকনে অবশ্যই উদ্ঘাটিত হোতে বাধ্য।

সুন্দরম্-এর এই বিশেষ সংখ্যা বস্তুত সে দিক দিয়ে বিশেষভাবে দেশের সকল শিল্প রসিকদের কাছে আজ—শিল্পীদের নিকট হোতে শতাব্দীর সুনির্দিষ্ট বিশেষ বাণী বহন কোরে উপস্থিত। সুভো ঠাকুর আশা করে, আধুনিক শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি মাত্রের কাছেই তা উপেক্ষণীয় হবে না।

রাশিয়ার ইদানীং কালের রাশিয়া-বাদে-বিখ্যাত-সাহিত্যিক পাস্তারনায়ক ইহ জগৎ হোতে বিদায় নিয়েছেন। মানুষের চরিত্র যেমন নানা পারিপার্শ্বিকতার উপর নির্ভর কোরে গোড়ে ওঠে, মানুষের খ্যাতিও নানা সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনার পারিপার্শ্বিকতায় অকস্মাৎ ধূমকেতুর ন্যায় আকাশে উদয় হোতে দেখা গেছে। সুভো ঠাকুর বলে, পাস্তারনায়ক নোবেল প্রাইজ্ না পেলেও ভালো দরের কবি হিসেবে হয় তো নাম রাখতে সক্ষম হোতেন। কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েও সুভো ঠাকুরের মতে, তাঁর উপন্যাস চিরন্তনতার জাবদা খাতায় জোমে উঠতে সক্ষম হবে কি না সন্দেহ। কারণ তাঁর এই উপন্যাসটি হাউই-এর ন্যায় ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার শক্তি আত্মশক্তিতে যতখানি না হোক, পরোক্ষভাবে সংগ্রহ কোরেছিলো পারিপার্শ্বক রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতের শক্তি থেকেই।

আজ থাক সমালোচনা ও আলোচনার কথা। সুভো ঠাকুর একান্তভাবে এদেশের শিল্পীদের তরফ হোতে কবি বরিস পাস্তারনায়কের আত্মার নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রার্থনা করে।

এই সম্পাদকীয় শেষ হবার সময় সময় অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত বাংলার অভিজাত কবি ও একদা অভিজাত পত্রিকা 'পরিচয়'-এর পরিচালক-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত হৃদরোগে স্বর্গত হোয়েছেন। আধুনিক কবিদের এবং কবিতা আন্দোলনের মধ্যে তাঁর স্থান অনন্যসাধারণ। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কবিবন্ধুবর্গের শ্রদ্ধানিবেদনের মধ্যে নিতান্তই তা প্রকটিত।

কবি সুধীন্দ্রনাথের ভাগের মহাভাগ্য যে কবিতা লিখে অথবা সাহিত্য রচনার দ্বারা সংসার যাত্রা নির্বাহ করার পথে তাঁকে পা বাড়াতে হয়নি। তাই কার্যতঃ, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর আসন সাহিত্যের অর্থতান্ত্রিক ভৈরবী-চক্রের চক্রান্তে কদাচ কলুষিত হয়নি। তিনি সৌদক দিয়ে তাঁর আভিজাত্য শেষ দিন অবধি বজায় রাখতে পেরেছিলেন। এ যুগে এর চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কি থাকতে পারে?

তিনি এ যুগের শুধু যে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন তা নয়—তাঁর শিল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধাদিও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। সম্ভব হোলে পরবর্তী কোনো সংখ্যায় সে সম্পর্কে আলোচনা হোতে পারে।

এই আকাশ নীহারিকা একটি গানের সুরে
আনন্দময় কোন খেলায় অনন্তকাল জুড়ে
রইল মেতে! সৃষ্টি কাঁপে, বিরামহীন বীণা
প্রেরণাময়।
কৃষ্ণচূড়া জীবনরাঙা কি না
তাইত ভাল, আত্মভোলা আপনি আসে যায়।
বসন্ত শেষ? বর্ষা আসে, কি ঢল যমুনায়!

প্রাণের অপার বন্যা মুক্তির আশ্চর্য গৈরিকে বর্ণময়
তারাজ্বলা রাত্রির আকাশে যেন তার সুরের মূর্চ্ছনা,
বোরিস পাস্তেরনাক একাকী গভীরে কান পেতে
শুনেছ। ধরেছ গান বিপ্লব বিচূর্ণী শান্তি মন্ত্রে।

নেহাতই মাটি তবু এ পৃথিবী অমৃতসা পুত্রদের মাতা।

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

বিদেশে রবীন্দ্রচিত্র প্রদর্শনী

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত অপূর্ব একটি ছবি।

১৯৩০ সালে প্যারিসে যখন ছবির প্রদর্শনী হয় তখন স্বদেশে মহাকবির এই নূতন প্রতিভার পরিচয় ও স্বীকৃতি হয় নি। এ দেশে অনেকেই এ সংবাদে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। কাগজে অবশ্য দু-একবার দু-একটি নক্সা ছাপা হয়েছিল; বলা বাহুল্য, তা কারও মনোরঞ্জন করতে পারে নি। কবির খেয়াল বলেই উদ্ভটাকৃতি গুলিকে প্রশংসা করতে হবে এমন কোনো কথা নেই—এমনি একটা মনের ভাব নিয়ে অনেকেই বিদ্রূপমিশ্রিত হাস্য করে জিজ্ঞাসা করতেন, —এগুলোর মানে কি? ওটা কি বস্তু? ওটি কোন্ জানওয়ার?

মানে থাকা তো সম্ভবই নয়—দৃশ্য কোনো বস্তুর প্রতিরূপ তো তিনি আঁকতে যান নি। খাতার পাতায় কাটাকুটির অসামঞ্জস্য ঢাকতে গিয়ে ফুটে উঠেছে নকশা। কবি বলতেন—যাদের মৃত্যু হল তাদের একটা ভালোমত কবর তো দেওয়া চাই—(I must give them a decent burial!) প্রবাহ যেমন প্রবাহকে টেনে আনে—Osmosis এ যেমন চলে তরুর প্রাণ রস, তেমনি কলমের মুখে একটি রেখা টেনে আনে আরো সংগত রেখা—গড়ে ওঠে রেখার জগৎ, রূপের আকার, স্বেচ্ছাকৃত প্রতিরূপের নয়।

প্রদর্শনীতে ছবির নামকরণ প্রসঙ্গে প্রবাসী-সম্পাদককে কবি লিখছেনঃ—"ছবির নাম দেওয়া একেবারে অসম্ভব।...আমি তো কোনো একটা বিষয় ভেবে আঁকি না।" কলমের মুখে পেন্সিলের ডগায়, তুলির আঁচড়ে অজ্ঞাতপরিচয় নানা আকৃতি অকস্মাৎ ভেসে ভেসে ওঠে। জনকের লাঙ্গলের ফলার মুখে সীতার জন্মের মতই এই শিল্পের অভাবনীয় আবির্ভাব। কিন্তু শিল্পী জানেন যে আকারকে যতক্ষণ নামের পরিচয়ে চিহ্নিত করে না নেওয়া হয় ততক্ষণ মন আরাম পায় না অতএব তাঁর অনুরোধ— "যাঁরা ছবি দেখবেন তাঁরাই নামকরণ করুন। যারা নামের আশ্রয় হারা তাদের আশ্রয় দিন।"

এরকম কথা কবি ছবি সম্বন্ধেই প্রথম বলেন নি। সাহিত্য সম্বন্ধেও একথা সত্য। যেমন পাঠক ও লেখকের ভাবনার সংগমে কাব্যের সার্থকতা তেমনি দর্শক ও শিল্পীর চিত্তসংগম চাই, তবেই ছবি ছবি হয়ে উঠতে পারে। বোঝবার মন চাই, দেখার চোখ চাই, তাও সাধনাসাপেক্ষ। বর্তমান যুগে এদেশে সে সাধনার ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ। পাশ্চাত্য দেশের মধ্যযুগীয় শিল্পের প্রভাব হ্যাভেলের সাহায্যে যাঁরা কাটিয়ে উঠে ভারতের ঐতিহাসিক শিল্পদৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছিলেন কবি তাঁদের পাশেই ছিলেন। এজন্য হ্যাভেলের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। ১৯২০ সালে লণ্ডনে একটি বক্তৃতায় কবি বলেছিলেন—"ইয়োরোপে একটা চেষ্টা দেখি গ্রীসের কাছে খ্রীষ্টধর্মের কাছে আমাদের যে গভীর ঋণ আছে সে কথা খুব জোরের সঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া হয় এবং ভারতবর্ষের যা কিছু দান তা অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা দেখা যায়। এমনকি ভারতবর্ষ নিজেই অনেক

মৈত্রেয়ী দেবী
রবীন্দ্রনাথের স্নেহ সান্নিধ্য-ধন্যা। প্রখ্যাত সাহিত্যিক। কবি। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', 'কবি সার্বভৌম' ইত্যাদি গ্রন্থ-রচয়িত্রী।

সময় নিজের মূল্য বোঝেনি। তখন ই. বি হ্যাভেলের মত মানুষেরা অসাধ্যসাধন করেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে সৃষ্টিশক্তি যখন জাতীয় ভাবনা-ভ্রষ্ট হয়ে কেবল পশ্চিমের অনুকরণে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল তখন হ্যাভেল তাঁর ছাত্রদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, কখনো অন্যের অনুকরণ কোরো না, নিজের আত্মাকে লাভ করবার চেষ্টা করো, তাকেই শিল্পে প্রকাশ করো। ...তখন নব্যভারত তাঁকে সন্দেহের চক্ষে দেখেছিল, তাঁকে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল কিন্তু তিনি জয়ী হয়েছিলেন এবং বাংলা দেশের এই নব শিল্প সৃষ্টি যদিও এখন সবে মাত্র শুরু হয়েছে এবং মার্জিত হয়ে ওঠে নি, তবু এর মহৎ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে—হ্যাভেলের প্রভাবেই এটি ঘটেছে।"...

ভারতীয় শিল্পের এই অভ্যুত্থানের পিছনে শিল্প-প্রেরণার সঙ্গে স্বাজাত্যাভিমানও কিছুটা ছিল তাতে সন্দেহ নেই, নষ্ট গৌরব, হৃত সৌন্দর্য, পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকারে শিল্পরুচির সঙ্গে সমসাময়িক চিন্তার দাবি অগোচরে নিজের অধিকার বিস্তার করেছিল।

জাপানী শিল্পীরা এলেন। শিল্পবিদ্‌ ওকাকুরাও বললেন—আত্মানং বিদ্ধি, আপনাকে জানো। মধ্যযুগীয় ইয়োরোপীয় চিত্রকলা, যা আপনার বিষয় পরিচয়ে নিপুণ এবং নিশ্চিত, মন সরে গেল তার থেকে। এশিয়ার ধ্যান দৃষ্টির দেখা দিয়ে দেখতে চাইল, গড়তে চাইল ছবির জগৎ। ইয়োরোপে তার পূর্বেই অন্য-পথে নূতনের সন্ধানে যাত্রা চলেছে। নূতন যুগের শিল্পী বলছেন—"আমি যা দেখছি তাই তো আঁকি না—যা দেখেছি তাই আঁকি" যা দেখেছি, দেখার মধ্যে যে অংশ আমার সত্তা, সে তো বাহিরের বস্তুতে নেই। সে আছে আমাতেই। দেখার মধ্যে বস্তু ও সত্তার মিলনের এই গভীর তত্ত্বই কবি তাঁর 'মানসী' গ্রন্থের প্রথম আশ্চর্য কবিতাটিতে বলেছেন :

"বাহিরে পাঠায় বিশ্ব, কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে—
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে, ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে,
সেই মোহ মন্ত্রগানে, কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখচ্ছন্দ,
সে আনন্দক্ষণগুলি তব করে দিনু তুলি
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।"

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব, কত গন্ধ গান দৃশ্য, কিন্তু তাকে গ্রহণ করে কে? মন। সেই মন বহুমুখী, বিচিত্র, তার জারক রস কোথাও গাঢ়, কোথাও তরল। সেই মনের রসায়নে তাই একই দৃশ্য পৃথক হয়ে যায়। চোখের দেখাকে মন দিয়ে ধরে রাখাতেই আধুনিক শিল্পের নূতন বাণী। প্রতিরূপ সৃষ্টি নয়, রূপসৃষ্টি। সে রূপকে কেবল বস্তুর আকারে পাওয়া যাবে না—কারণ মন যে নিরাকার। ছবির যে অংশে শিল্পীর মনের সংযোগ সে অরূপ নিরাকার ভাবরস। ভাবকে যদি আকারে ধরতে যাই তখন আবির্ভূত হয় যে অভাবনীয় নূতন যুগের শিল্পে আমরা তারই আবির্ভাব দেখি। সব সময়ে যে তা সার্থক সৃষ্টি হয় তা নয়, কারণ মনের প্রকারেই তার আকার। সেই মন বহুবিধ বহুস্তরের, তার গুণাগুণের তারতম্য

বিপুল। এই তো গেল স্রষ্টার কথা। আবার দর্শকের মনের সংবেদনা জানিয়ে তুলবার জন্য অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। সে আনুকূল্যও সাধনাসাপেক্ষ। এ যুগের শিল্পী তাই শিল্প সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টি করেন দর্শকের মন। অতি ধীরে, অলক্ষ্যে, অগোচরে সে কাজ চলে। বর্তমানে রবীন্দ্রচিত্রকলা তাই যে সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে এসেছে রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে এদেশে তা ঘটেনি। প্রধান বাধাই ছিল—ছবির কোনো অর্থ নেই—They tell no story কিন্তু সেদিন রেখা ও রঙের ভঙ্গিমায় এমন কথাই বলা হচ্ছিল যা রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্যময়ী পরমকুশলী ভাষাও দীর্ঘকাল ধরে বলে নি বা বলতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুদ্ধারের মৃতসঞ্জীবনের আবহাওয়ায় কিন্তু তিনি তেমনি মানুষ যাঁর মধ্যে অতীত রস যোগায় ভবিষ্যৎকে উদ্ভিন্ন করবার জন্য—পুনরাবর্তন তাঁর চলার রীতি নয়। একটি সভাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে দেখে বিখ্যাত থিয়োস-ফিস্ট অরুণডেল লিখেছিলেন : "রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করা মাত্রই সূক্ষ্ম পরিবর্তন হল—কোন যাদুমন্ত্রে তিনি আমাদের চোখের সামনে একটি নূতন ছবি নিয়ে এলেন—আমাদের কাছে অতীত প্রকাশিত হল, ভবিষ্যৎও উদ্ভাসিত হল। যে ভবিষ্যৎ অতীতের চেয়ে কম মনোহারী নয়। তিনি যেন অতীতের হয়েও ভবিষ্যতের, কেবলমাত্র অতীতের পুনরাবৃত্তি নয়। যে ভবিষ্যৎ তিনি উদ্ভাসিত করেছেন তারমধ্যে অতীতের পরিচয় আছে কিন্তু তা কোনো মতেই অতীতের সঙ্গে এক নয়—তাঁর সংস্পর্শে আমরা যেন সেই চিরন্তন অখণ্ড ভারতে চলে গেলাম—যে ভারতের পরিবর্তন নেই পরিবর্ধন আছে..."

কবির সমগ্র সৃষ্টিতে এই নূতনের ঘোষণা যা অতীতের সংবাদ দেয় কিন্তু অতীতে সমাবৃত হয় না। অতীতের থেকে উদগত হয়ে অনাগতের গতি উদ্ভিন্ন, নূতন প্রবল বর্ণচ্ছটায়, চিন্তার আকাশ নানাভাবে রঙিন করে। ছবির জগতে সে কথা অতি স্পষ্ট হল। ভাষা ও ছন্দ কবিতায় আছেঃ—

> মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বন্ধ চারিধারে
> ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রি দিন
> মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ
> পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে
> ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
> উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন
> মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভার-হীন।"

সঙ্গীতের সেই অর্থভারহীন পক্ষে কবি ভাবের সংযোগ ঘটিয়েছেন। বাক্যার্থকে সুরের সঙ্গে একীভূত করে অপূর্ব নূতন সৃষ্টি লঘুপক্ষ হয়ে উধাও হয়েছে গূঢ়তম ভাবনার, নিবিড়তম অনুভবের দরজা খুলে দিয়ে। গানে এই আশ্চর্য সাধনা করলেন কবি, বাক্য ও সুর মিলল ভাবের রসায়নে। কথা সুরের বাধা হল না কারণ সুরের সঙ্গেই জগল ভাষা সুরের প্রকাশেই তার জন্ম। অধিকাংশ গানেই কথা ও সুর একত্রে রূপ নিল কবির অনুভবে। ভাব উন্মীলিত হল সুর বন্ধনে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে। দু-একটি ছাড়া কবিতায় সুর দেওয়া নয় রবীন্দ্রনাথের গান—তাঁর গান তাই একমাত্র তাঁরই সুরে ব্যতীত সত্যভ্রষ্ট হয়ে যাবে। একজনের কথা আর একজনের সুরে বসিয়ে এ জিনিস সম্ভব হতে পারত না—সুরের বেদনায় মিশেছে ভাবের বোধনা—প্রাণের রসায়নে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সেই বৈশিষ্টোই তার পূর্ণ সার্থকতা।

গীতশিল্পে যা করলেন চিত্রশিল্পে আনলেন তারই বিপরীত রীতি। গানের তরঙ্গে কবি মিলিয়ে-ছিলেন বাণী, রঙ্গের তরঙ্গ থেকে তুলে নিলেন তাকে —রেখার জগৎ হল বাকাহারা। বাক্যের অতীত যে বাণী বিশ্বের নানা লীলায় সৌন্দর্যরূপে নিরন্তর প্রকাশিত কবি চিত্তের তেমনি ভাষাহারা ভাবনার খেলা রঙ্গেরেখায় হয়ে উঠল বিচিত্র।

ষাট বছর বয়সে ছবি আঁকতে শুরু করে সংখ্যায় প্রায় দু হাজার কি তারো কিছু বেশী ছবি আঁকলেন মহাশিল্পী। জগতের ইতিহাসে এ বিস্ময়কর ঘটনা। এ ছবি নিয়ে উপযুক্ত আলোচনা আজও এদেশে হয় নি। এমন কি কতকগুলি ছবি আছে তারও সংখ্যা নির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালে এ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রায় ছিল না বললেই হয়। এদেশের প্রসিদ্ধ চিত্রকররাও অনেকেই অনুমোদন করেন নি—যদিও ভিতরে ভিতরে এই বিশেষ শিল্পরীতির প্রভাব তাঁদের চিত্তভূমিকে অসতর্ক আক্রমণ করেছে ও তার ফলে অনেকেরই অঙ্কন রীতির মোড় ফিরে গেছে। ভাবের তরঙ্গ রোধ করবে কে? আঠার অক্ষৌহিণীর চেয়ে সে প্রবলতর।

এ নিয়ে বিশদ আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। আমরা শুধু বিদেশে রবীন্দ্রচিত্রকলার সমাদর প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলব। দেশের কারও ভালো লাগুক্ বা না লাগুক ছবির নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। এই নেশার তাগিদে আঁকার মিডিয়ামের ঘটেছে বহুবৈচিত্র্য। হাতের কাছে যা পাওয়া গেল তাই দিয়েই রেখার টানে রূপের অরূপ মূর্তি রেখার জগতের আপন কথা বলতে লাগল। শিল্পের অর্থই অন্যের সমর্থনে।

কবি কবিতা শোনাতে চায়, তা শ্রোতা সমঝদার হোক বা না হোক। এই তাগিদেই অশিক্ষিতা মালিনীকে কবি কলিদাসের কাব্য শুনতে হয়েছিল। কবি ভাবলেন ছবি কাকে দেখাব? এই প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলছেন :

"আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়োরোপে আমার ছবি দেখাতে নিয়ে যেতে কেবলি বলতে লাগলেন। ছবিগুলি প্যারিসে দেখানো তাঁর ইচ্ছা। ফ্রান্সে একজন নামকরা চিত্রকরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমি এ সম্বন্ধে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করলুম।

"কখনই নয় মিঃ তাগোর, এমন হঠকারিতা করবেন না—কারণ আমাদের দেশের লোকের হাসবার নিষ্ঠুর শক্তি আছে। হঠাৎ আপনার ছবির প্রদর্শনী করে আপনার যশ খ্যাতিকে বিপন্ন করবেন না।"

তাই তখন সে প্রস্তাব ছেড়ে দিলাম। পরে একজন করুণাময়ী মহিলা আমার বাছাই-করা ছবিগুলি প্যারিসের শ্রেষ্ঠ শিল্পরসিকদের দেখবার জন্য নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন।"

ছবির প্রদর্শনীর পূর্বে Pre-view-র ব্যবস্থা হল। সে দিনটি সম্বন্ধে কবি এক জায়গায় বলছেন : ছবি সাজানো হল। আমি পাশের ঘরে ছিলাম। তাঁদের সামনে আসতে আমার হৃৎকম্প হচ্ছিল।...তারপর দর্শকদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক আমার ঘরে ঠিক ফরাসীভাবে ছুটে এলেন—আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, চুম্বন করলেন। তিনি বললেন, আমি জানতাম তুমি মহৎ কিন্তু তুমি যে কত বড় তা কখনই বুঝতাম না যদি তোমার ছবি না দেখতাম।"

এ বর্ণনা কতকটা গীতাঞ্জলি পাঠের প্রথম দিনের সঙ্গে মিলে যায়—যদিও ইংরেজ ও ফরাসী প্রতি-ক্রিয়ার প্রকাশ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, আন্দ্রে কারপেলস ও কাউন্টেস দ্য নোয়াই এ রকম কয়েক জন শিল্পী ও শিল্পরসিকার সাহায্যে প্যারিসে ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল। কাজটি সহজ ছিল না। এ সম্বন্ধে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর উৎসাহ ও সাহায্যের কথা কবি বহুস্থানে উল্লেখ করেছেন, তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কোমতেস দ্য নোয়াই নিজেও ঐ চিত্রপ্রদর্শনী সম্বন্ধে অতি অপূর্ব একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সে প্রবন্ধে এই নারীর গভীর কবিত্ব, সুদূরপ্রসারী আলোকো-

ভাসিত দৃষ্টি দেখা যায়। কোমতেস্ দ্য নোয়াই ফ্রান্সের প্রসিদ্ধা মহিলা কবি। তিনি গ্রীক বংশোদ্ভবা ও বিখ্যাত দ্য নোয়াই বংশে বিবাহিতা। তাঁর সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯২১ সালে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "Edges of Time" গ্রন্থে এঁর উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন : Before she left she confessed to father that she had come to conquer but all her variety had vanished on meeting him and now she was going away a devotee and a worshipper.

যে দিন ইনি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন আঁদ্রে কারপেলেসের ভগ্নী সুসান কারপেলস সেখানে উপস্থিত ছিলেন—তিনি তখন স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে কবির সেক্রেটারির কাজ করছিলেন ও কবিতা অনুবাদ করছিলেন। তাঁর নিজের মুখে ঐ দিনের ঘটনার যেমন বর্ণনা শুনেছি তারই যথাযথ বিবরণ দিচ্ছি। ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও তা কৌতূহলোদ্দীপক।—'গ্রীকবংশোদ্ভবা কোমতেস্ দ্য নোয়াই অপূর্ব রূপসী। তাঁর গভীর কালো চোখে পূর্ব দেশের রহস্য, তরঙ্গায়িত কালো চুলে নিখুঁত সুগঠিত চমৎকারিণী মুখের প্রভায় তিনি ফ্রান্সের মনোহারিণী। তাঁর রচিত প্রেমের কবিতা যুবকচিত্তকে স্পন্দিত ক'রে সকলের মুখে মুখে চঞ্চল। তাঁর অঙ্গুলি হেলনে বঙ্কিম কটাক্ষে বহু বীর পরাভূত। একদিন পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর অনুরক্ত ভক্ত শ্রীযুক্ত কাহ্নকে নিয়ে তিনি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন।

শ্রীমতী সুসান বললেন, সে দিনের দৃশ্যটি তাঁর মনে ছবি হয়ে রয়েছে। কোমতেস্ অপূর্ব ভূষণে সজ্জিতা হয়ে এসেছেন। মাথায় সোনার বরণ সিল্কের শিরোবন্ধ ঝলমল করছে, ভেলভেটের দুই রঙ্গা দীর্ঘ পরিচ্ছদ, বাহিরের রং গাঢ় আর ভিতরের উজ্জ্বল সোনালী তাঁর চলনের প্রতি ভঙ্গীতে ঝলমল করে উঠছে। কবির সামনে বসে এই লাবণ্যবতী হাস্যে কৌতুকে লাস্যময়ী হয়ে উঠলেন। তাঁর রূপের ছটা মুখের হাসি ঝলমল করতে লাগল—মনোহারিণীর ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণা হলেন। কোমতেস্ যতই চঞ্চলা বিলাস লাস্য মুখরা হয়ে রূপচ্ছটা বিকীর্ণ করতে লাগলেন কবি ততই গম্ভীর, সুদূর, অনালভ্য হয়ে গেলেন; তাঁর দুই হাত কোলের উপর সংবদ্ধ, চক্ষু নিম্ননিবদ্ধ অর্ধমুদিত, স্থির মূর্তি মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহের মত দুর্জ্ঞেয়। যতই তাঁর সামনে মোহের ছলনাজাল ছড়িয়ে পড়ছিল ততই তিনি যেন ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বে চলে যাচ্ছিলেন সমস্ত তুচ্ছতা অতিক্রম করে অনধিগম্য গভীরতায়। অবশেষে কিছু পরে কবি তাঁর উদাসীন আনত দৃষ্টি ঈষৎ উত্থিত করে মৃদু হাস্যে বল্লেন—"let us not forget that we are both Poets".

মুহূর্তে বুদ্ধিমতী রমণীর কাছে ধরা পড়ল নিজের ভ্রম, জাগ্রত হয়ে উঠল তাঁর অন্তরাত্মায় আপন স্রষ্টারূপ। তিনিও কবি, নিঃসংশয়ে সেই তাঁর যথার্থ স্বরূপ, মোহময়ী নারীর ভূমিকা তুচ্ছ খেলা মাত্র। তাঁর মুখের ভাব গেল বদলে, কটাক্ষ হল ভক্তিভারানত, নম্রস্বরে তিনি বললেন—আপনাকে আমার একটি কবিতা শোনাব?' তারপর প্রায় দু ঘণ্টা ধরে ঝরল কবিতার সুর নির্ঝর। কবি বাংলায় কবিতা পড়লেন, কোমতেস্ ফরাসীতে—ফরাসী প্রেমের কবিতা। নারীর কণ্ঠে দেহবন্ধ প্রেমের কামনাসঙ্গীত জ্বলছিল 'পূটপাক প্রতিকাশ' আর কবি পড়ছেন গীতাঞ্জলি—

ঊর্ধ্বগতি প্রেমের শিখা সেখানে জ্বালিয়েছে 'আগুনের পরশমণি', মনকে উধাও করে নিয়ে চলেছে স্বর্গাভিমুখে। নারীর কণ্ঠে বাজছে ফ্রান্সের যা কিছু মোহন তারি মধুরতম সুর আর ভারতের মহাকবি ধ্বনিত করছেন মানবজীবনের গভীরতম সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠ ভাবনা, মহত্তম আশা। কিছুক্ষণ এই অপূর্ব আলাপের পর কোমতেস্ যখন বিদায় নিলেন তখন তাঁর মোহিনীমূর্তি অপহৃতা, পূজার সৌরভে নম্র তাঁর সুন্দর মুখ ভক্তির সৌন্দর্যে অপরূপ।

এই কোমতেস্ দ্য নোয়াই ১৯৩০ সালে ছবির প্রদর্শনীতে কবির স্বপ্ন চোখে দেখলেন। তিনি লিখছেন : "আজ ঠাকুর আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে তাঁর স্বপ্নের ঝুলি উজাড় করে দিয়েছেন। তিনি পূর্বেই বলেছেন :—'আমি তারার ভাষার অর্থ, তরুর নীরবতার বাণী, বুঝতে পারি। একদিন আমি আমার দেহের বাহিরে আলোর যবনিকার ওপারে সেই আনন্দের সন্ধান পাব'—তাঁর মুখের অগ্নিময়ী বাক্য সমস্ত ভবিষ্যতকে আলোকিত করে দেয়। পরম ধৈর্যের সঙ্গে তিনি নিজেকে চিনে নিতে, আত্মপরিচয় জানতে চেষ্টা করেন। কখনো চেনেন, আবার সহসা আসে সন্দেহ।.....লোকে তাঁর প্রশংসা করে কিন্তু দ্বিধা সন্দেহে তিনি স্মিত মুখে নীরবে থাকেন। যখন তিনি কাব্য রচনা করছিলেন, যে কাব্যে তারার অলক্ষ্য ভাষা এসে মিশেছে, তখনই তার মনের দরজায় অসংখ্য নৃত্যশীল আকৃতি, কল্পনার মূর্তি এসে ভিড় করে দাঁড়াল। তাঁর যুক্তিবদ্ধ বুদ্ধি তাদের চেনে না—তারা বিশ্বের সব দিক থেকে এসে তাঁর চিত্তের নিভৃত দ্বীপটিকে আক্রমণ করে। সক্রেটিস বলেছিলেন—'আত্মানং বিদ্ধি' এবং আমি গ্রীসের কন্যা হয়ে এই মহৎ উপদেশ অগ্রাহ্য করতে পারি না, যা বলে বুদ্ধি বিবেচনা করে নিজেকে দেখ, যুক্তিতে নিজেকে স্থির রাখ, সমস্ত ছায়ামূর্তি দূর করে দাও। কিন্তু আত্মার আরো নির্দেশ আছে—!

কবি ইচ্ছাপূর্বক নিয়ম অগ্রাহ্য করেছেন তিনি নিজেই নিজের নিয়ম। তিনি স্থির করেছেন তাঁর স্বপ্ন যা দিয়ে গড়া তাকেই বস্তুরূপ দেবেন। ফলে এক বিপুল কর্মোদ্যম অসংখ্য বিচিত্র আকার নিয়ে আজ আমাদের সামনে এসেছে। এখানে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অন্তরচারী গোপন দৃশ্যমূর্তি—অসংখ্য অগণ্য অত্যাশ্চর্য। যে প্রেরণায় এই নিম্নমূলপ্রসারী বহু প্রাচীন বনস্পতিতে এমন অপ্রত্যাশিত ফল ফলেছে আমরা তার প্রশংসা করি।—জানতে কৌতূহল হয় কি করে ঠাকুরের মত মানুষ যাঁর কল্পনা বুদ্ধিচালিত, তিনি এই অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি করলেন—যা চোখকে মোহিত করে মনকে নিয়ে যায় অজ্ঞাত দেশে যেখানে কল্পনার বস্তুই বাস্তবের চেয়ে বেশী সত্য। তাঁর দারু-বর্ণ পারাবতের মত সুন্দর হাতে তিনি কবিতা লিখছিলেন সহসা সেই পুঁথির পাতায় যেন কোন অনির্বচনীয় সুরার মত্ততায় তিনি কঠিন, নির্দিষ্ট, পরিশ্রমের পথ থেকে কল্পনার অদম্য শক্তির ক্ষেত্রে মুক্তি পেলেন। কত এলোমেলো নকশা করলেন, তার পর যেন কোন স্বর্গীয় প্রদর্শকের ইঙ্গিতে বাধ্য শিষ্যের মত তাকে পূর্ণতর করে নিখুঁত করে অবচেতনের ঐশ্বর্য ঢেলে দিতে লাগলেন। এইজন্য যার অশ্রুর সম্পদ আছে, যে নিজের ব্যথার কারণ না জেনে কাঁদে সেই শুধু অনুভব করবে, দেখতে পাবে, শিশিরের রহস্যময় বাষ্পাবরণ, যে সূক্ষ্মজাল শুধু দেবতারা দেখতে পায়—কোন অনির্বচনীয় উৎস থেকে

সে দৃশ্য তার চোখের সামনে আসবে, তার চোখ জলে ভাসবে।...

ঠাকুরের শিল্প রচনা প্রথমে মনে হয় স্বপ্নময় কুহেলিকাবৃত—আত্মা যেন ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করছে—কিন্তু ক্রমেই তাদের বিস্ময়কর উৎকর্ষ পরিষ্কার হয়ে আসে। এবং এই জ্ঞানীর সদ্যোজাত প্রতিভার সামনে তার প্রাচুর্যে ও সূক্ষ্মতায় মন অভিভূত হয়ে যায়। ঘন ছায়ার বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে এক জীবন্ত বিশ্ব পুনঃসৃষ্টি করে। যে কবির মনোমোহিনী সঙ্গীত আমাদের মনে কত সূক্ষ্ম সত্য গুঞ্জরণ করেছে আজ আমাদের তিনি নিয়ে গেলেন অসংখ্য বিচিত্র মানব মূর্তির জগতে, যারা ছায়ারূপে একত্রিত হয়ে দৈত্যের হাসি হাসছে।...তবু এও সত্য কবির ছবিতে রঙে ও রেখায় সুন্দরের স্থান বেশী। মহিমান্বিত মুখচ্ছবি, উন্নতভঙ্গী, জলের তরল লাবণ্য, আর গভীর নীল রাত্রি যেখানে সেক্সপীয়ারের সুখী-প্রণয়ী যুগল আমাদের এমন স্বর্গে নিয়ে যায় যে স্বর্গে মৃত্যুর সমস্ত চিন্তা অপসারিত।...কিন্তু ঐ শক্তিশালী মুখ ঐ দানবীয় মুখোশ, ওই যে ছুরির মত শাণিত অবিশ্বাস ঠোঁটের কোণায় ঝক্ ঝক্ করছে ওগুলো ভয় করে না কি? আর কি বিস্ময়কর ঐ চঞ্চলা নিরালম্ব হরিণীর আকৃতি।...অভিভূত চিত্তে এই নারী কবি ভাবেন রবীন্দ্রনাথকে তিনি যা চিনেছিলেন যা ভেবেছিলেন তার চেয়ে কত গূঢ়, কত অজ্ঞাত, কত ব্যাপক তাঁর মনগহন যেখানকার রহস্যর খবর এই ছায়ালোকের মূর্তিরা বহন করে এনেছে। তাই তিনি লিখছেন—'আর কি কখনো তোমাকে সেই শিশু সরল ভাবতে পারব যা এতদিন ভেবেছি'।

[illegible]পী আর এম্ মিলওয়ার্ড ক্লান্সের পিগ্‌লী গ্যালারীতে প্রদর্শনী দেখে এসে লিখছেন: ..."আমি কি করে বর্ণনা করি কি দেখলাম?...কোনো ছবির নাম নেই—স্বপ্নকে কি নামে বাঁধা যায়?...নিষ্ঠুর কালো আকৃতি আছে যারা ভয় দেখাচ্ছে, তিনকোণা সুন্দর আকৃতি আছে যাদের দিকে চেয়ে থাকলে তারা নৃত্য করে ওঠে। স্বপ্নই বটে, অতিপ্রাকৃত সুন্দর। ...সব রকম প্রাগৈতিহাসিক জন্তু আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তারা কি দিব্য প্রকাশ? কতগুলি আলপনা মাত্র, কতগুলি ভয়াবহ! একটি অপূর্ব মনোমোহিনী ছবি, গাছের দিকে উন্মুখ হরিণের মূর্তি, তার পিছনে একটি আলোর ধারা নেমে এসেছে—এর মধ্যে পশু জগতের সমস্ত কবিতা বিধৃত আছে।...ইতিপূর্বে কখনো কোনো ছবির প্রদর্শনী আমাকে এমন ভাবে বিচলিত করেনি!"

বিদেশী সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কবির সঙ্গে চিত্রশিল্পীর যোগ কোথায়?"

"কোথাও নেই। যখন আমি লিখি আমার মনের সামনে দৃশ্য থাকে, একটা মানসিক রূপ থাকে, আমার কবিতা সেই রূপটিকে সেই সৃষ্ট মূর্তিকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু যখন আমি আঁকি আমি জানি না কি আঁকব।...আমি কলম তুলে নিয়ে যেমনি সুরু করি সহসা হয়ত একটা মুখ, একটা ফুল বা একটুকরো মেঘের আভাস দেখতে পাই...কখনো কখনো আমি ভুল করি। যেন ফুলের বোঁটাকে নামাতে গিয়ে ডাঁটাটি ভেঙ্গে গেল—তখন রেখাটি মরে যায়—আমি তাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে ফেলেছি। এই অগণ্য আকারগুলি ছোট ছোট আত্মার মত তারা আমার কাছে মুক্তির আশা করে।"

ড্রেসেডেন বার্লিন ও মিউনিকে প্রদর্শনী হল;

ড্রেসডেনের আর্ট এসোসিয়েশন লিখলে, "ঠাকুরের ছবি তাঁর কবিতা ও গানের মতই তাঁর আত্মার এক একটি কণা। অতি স্বাভাবিক ছন্দে মনের রূপ নিসৃত হয়ে এসেছে।"

মিউনিকের তাঁর একটি বিখ্যাত গ্যালারীতে ছবির প্রদর্শনী জনসাধারণকে চমৎকৃত করেছিল। কবি উদ্বোধন-ভাষণে বল্লেন "আমার কবিতা আমার দেশবাসীর জন্য, আমার ছবি আমি পশ্চিমকে উপহার দিলাম।" কাগজে লিখল: "এ ছবির ভঙ্গী সম্পূর্ণ নূতন। এর বিন্যাস শৈলী ইয়োরোপীয়। কবি বলেন সেজন্য তাঁর গর্ব হয়, কারণ এতে বোঝা যায় তাহলে তাঁর নিজের মধ্যে যথার্থই পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন ঘটেছে।

এরপর রাশিয়া ইংল্যান্ড আমেরিকা সর্বত্রই প্রদর্শনী হল। দেশ বিদেশের বিশিষ্ট শিল্পীরা কবির অভূতপূর্ব সৃষ্টি রহস্যে বিস্মিত আনন্দিত হয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে তাঁর স্থান স্বীকার করলেন। তবু তাঁর নিজের মন ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। রাশিয়াতে তিনি বলছেন "আপনাদের প্রশংসা পেয়ে আমার আনন্দের সীমা নেই—কারণ আমি জানি এদেশের দক্ষ শিল্পী ও শিল্পরসিকরাই আমার ছবির অনুমোদন করলেন। আমার এ বিদ্যা নতুন বলে এখনও আমি এ সম্বন্ধে সহজ হতে পারি নি!"

নিউইয়র্ক টাইমস লিখছে: "৫৬নং রাস্তার ছবির গ্যালারীতে ঠাকুরের ছবির প্রদর্শনী খোলা হল। উঁচু পিঠওলা একটা প্রকান্ড চেয়ারে গ্যালারীর এক কোণে কবি বসে আছেন—সমস্ত ঘর নরনারীর মিশ্রিত জনতার পূর্ণ। সেখানে মিসেস্ রুজভেলট ও জর্জ রাসেল প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। কবি বলছেন আমার এখনও এ সম্বন্ধে সংকোচ রয়েছে—তোমরা যখন আমার ছবি দেখবে ভুলে যেয়ো যে আমি কবি। একজন কবি এ ছবি এঁকেছে মনে করে তোমরা ছেড়ে কথা বোল না।...সাংবাদিক আরও লিখছেন: 'তাঁর শিল্পকৌশলের সঙ্গে তথা কথিত 'আধুনিক' শিল্পীদের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে—যদিও আধুনিক শিল্পীদের কাজে একটি বিশেষ ভঙ্গী ফোটাবার চেষ্টাকৃত কৌশলের ভাব লক্ষ্য হয়—কবির ছবিগুলিতে তার বিপরীত ভাব মনে আসে। এখানে অবচেতনের সহজ প্রকাশ শিশুসুলভ সারল্যে খেলার মত। অথচ যেন কোন ধূমায়িত অগ্নি প্রকাশের জন্য ব্যাকুল।"

আজ শিল্প জগতে রবীন্দ্রনাথের স্থান সুনির্দিষ্ট, আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের তিনি অন্যতম এবং এদেশে নব শিল্প জাগরণের তিনি পথিকৃত। বহুবিধ প্রতিভা থাকা তত বিস্ময়কর নয় যত বিস্ময়কর ষাঠ বছর বয়সে নূতনের পরীক্ষায় সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন—এই নিবেদনের আনন্দ তাঁকে এমনই পেয়ে বসেছিল যে বহু প্রয়োজনীয় কাজ ও লেখা ফেলে ছবিতে মগ্ন হয়ে থাকতেন তখনকার কাব্যেও তাই ছবির জগৎ খুব বড় হয়ে উঠেছিল। বিশ্বের দৃশ্যরূপ মনোলোকের মায়ার খেলায় করছিল ভাঙ্গা গড়া। এই বিচিত্র চিত্রময়ী বাণীর ভাষাতেই বিদেশে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কতকটা পূর্ণ হয়েছে। কবি ও লেখক রবীন্দ্রনাথকে, সমাজকর্মী ও তত্ত্বজ্ঞ রবীন্দ্রনাথকে বিদেশীর পক্ষে সম্পূর্ণ জানা অসম্ভব। সামান্য, কর্তিত, ছিন্ন-পরিবেশ, অনুবাদের টুকরা দিয়ে তা হবার নয়—কিন্তু ছবির ভাষা আশ্চর্য কথা বলেছে—দেখিয়েছে একটি গভীরতম মনের সুদূরপ্রসারী ব্যাপক বিচিত্র গতি।

মৈত্রেয়ী দেবী লিখিত
এই প্রবন্ধটির সমস্ত চিত্র
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত।

সম্পাদকীয় | দ্বিতীয় দফা

আজকের অসমে ঘটিত ঘটনায় সুভো ঠাকুর ভারতীয় শিল্পী হিসেবে লজ্জায় মুহ্যমান এবং আত্মধিক্কারে অধোবদন।

এইতো গতসংখ্যা সুন্দরম্-এ সুভো ঠাকুর প্রতিবেশী রাজ্য হিসেবে অসমের আধুনিক খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী শ্রীহেমন্ত মিশ্রের জীবনী ও শিল্প সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশ আগ্রহের সঙ্গে আয়োজন কোরেছিলো। এমন কি এ সংখ্যাতেও অসম সরকারের দিল্লীর বিশ্বকৃষি সম্মেলনে নির্মিত স্টলের কৃতকার্যতা সম্পর্কে আলোকচিত্র প্রকাশেও—উদ্যোগের কোন ত্রুটি করে নি। এ স্থানে একথার উল্লেখের কারণ আর কিছুই নয়—কেবলমাত্র চোখে আঙুল দিয়ে বলার বাসনা যে, শিল্প এবং শিল্পী সর্বকালে, সর্বদেশে, সকল প্রকার দলাদলির ঊর্ধ্বে আসনে আসীন। মানুষের মনে ও জীবনে আশার আলো ফুটিয়ে তুলতে, নিঃস্বার্থপর ন্যায়ের অমোঘ বাণী দেশ কাল পাত্র নির্বিশেষে ধ্বনিত করতে, একমাত্র শিল্পীরাই সহস্র ক্ষতি স্বীকারেও পিছপাও নয়।

তাইতো সুভো ঠাকুর নেহাৎই আজ হতভম্ব!

যে রাজ্যে শিল্পী হেমন্ত মিশ্র, সুর-শিল্পী ভূপেন হাজারিকা ও দিলীপ শর্মার ন্যায় একজনও তরুণ সৌন্দর্যের পূজারী বিদ্যমান, যে রাজ্যে দেবকান্ত বড়ুয়া, মহেশ্বর নেওগ, হেম বড়ুয়ার ন্যায় সংস্কৃতি সম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্বও বর্তমান, যে রাজ্যে চলিহার মত বিদগ্ধ চিন্তাশীল মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত—সে রাজ্যে সমবায় রীতিতে নারী ধর্ষণ অথবা শিশু হত্যার তান্ডবলীলা অসম্ভব-সম্ভবের ন্যায় শোনায় না কি?

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে তদানীন্তন অসম রাজ্যের তরুণ আদর্শবাদী স্বর্গত সোদর সমান মাধব বেজ-বড়ুয়ার সঙ্গে অসমের আদ্যান্ত ভ্রমণের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা ঘটেছিল সুভো ঠাকুরের। সুযোগ ঘটেছিল সে সময় গৌহাটীতে অবস্থানকারী অসমের বিখ্যাত কবি স্বর্গীয় জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার সমাদর সমন্বিত আতিথ্য গ্রহণের। সেই ভ্রমণের ভিত্তিতে রচিত 'নীলরক্ত লাল হোয়ে গেছে' নামক পুস্তকের একটি পরিচ্ছেদে অসমের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বর্ণনায় একদা সুভো ঠাকুর চিত্তহারা হোয়ে লিখেছিল—

'অসম রাজ্যে নেই বেশ্যাবৃত্তি! নেই ভিক্ষাবৃত্তি! নেই চৌর্যবৃত্তি!—আধুনিক সভ্যতার পঙ্কিল পাপাচারের অনেক ঊর্ধ্বে অসম রাজ্যের আসন।'

আজ সেইখানে—খবরের কাগজের খবর যদি বিন্দুমাত্র সত্য বন্টনের দাবী রাখে, তবে বাধ্য হোয়ে বোলতে হবে—অসমে বেশ্যাবৃত্তি নেই বটে কিন্তু নির্বিকার চিত্তে নারকীয় রীতিতে বিশজন শিক্ষিত ছাত্র মিলে একটি নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার ঘটায় প্রতিবাদহীন সর্বজন সমক্ষে। অসমে চৌর্যবৃত্তি নেই বটে—তবে শীতল শোণিতে নির্দোষ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী নির্বিশেষে সরকারী পুলিশ প্রহরায় পাইকারি হারে হত্যা ও লুণ্ঠন চলে—দিবালোকে এবং অবাধ আনন্দে।

বুদ্ধ, অশোক, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর নিমক খেয়ে মানুষ ভারতবাসী হোয়ে, শেষ অবধি একথা কি বিশ্বাস কোরতে হবে যে, 'অন্ধকার মহাদেশ'-এর গরিলা-অধ্যুষিত অরণ্যানী কোন্ অভাবনীয় উপায়ে স্বাধীন ভারতের অঙ্গ রাজ্য অসমেই আপাততঃ বুঝিবা আরোপিত হোয়েছে।

তা না হোলে নরকাসুরিক উৎকট উল্লাসে ঐরূপ দানবীয় কার্য কারণের উন্মত্ত প্রদর্শনী কি রূপে সম্ভব?

অসমের এই বর্বরজনোচিত বীভৎস রূপ ও বিকৃত পাশবিক রুচির পরিচয়ে শুধু বঙ্গবাসী নয়—সারা বিশ্বের সুস্থমস্তিষ্কের অধিকারী মানব সম্প্রদায় আজ বাক্যস্ফূর্তিহীন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

এই সকল খবরের কাগজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র খবরও যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয়—তবে একথা ঘোষণা করলে অন্যায় হবে কি যে, সরকার ও জনসাধারণের যুগ্মলালনে অকলঙ্ক সমগ্র অসম রাজ্য আজ মদমত্ত গণ্ডারের ন্যায় গুণ্ডা আর দস্যু দলের অবাধ বিচরণের কাজিরংআ রিজার্ভ ফরেষ্টে রূপান্তরিত?

অসমে ভাষা নিয়ে বাঙ্গালীতে অসমীয়াতে শক্তি পরীক্ষা হোক, আনন্দের কথা। তাতে সুভো ঠাকুর মোটেও ক্ষুব্ধ বা বিচলিত নয়। বরঞ্চ অসমে অসমীয়াদের মাতৃভাষা সম্পর্কে একাগ্রতম অনুরাগ সুভো ঠাকুরের অন্তরে বহুবার শ্রদ্ধাপূর্ণ ঈর্ষা আনয়নে সক্ষম হোয়েছে। কিন্তু কোনো দেশের কেন—কোনো অসভ্য নরমাংস-খাদক আরণ্যক দেশেরও অভিধানে শক্তি পরীক্ষা অর্থে সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্যার্থীদের দ্বারা গুরুপত্নীকে অঙ্কে আমন্ত্রণের ইঙ্গিত জ্ঞাপন যে নয়—একথা বোধ হয় অবশিষ্ট শুভবুদ্ধির সাহায্যে এক্ষণে অসম-অধিবাসীরাও একবাক্যে স্বীকার কোরতে আর দ্বিধা বোধ কোরবেন না।

সুভো ঠাকুর উপরোক্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে কেন্দ্রের অনুকরণে খবরের কাগজের নিত্যনৈমিত্তিক নিবেদন ঢোক গিলে গলাধঃকরণ করার পক্ষপাতী। কারণ নেহেরুর ন্যায় ওরও অসমীয়া শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের উপর আস্থা, পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদান আজকের নয়, বিশ বছরেরও ঊর্ধ্বের। সেই অভিজ্ঞতায় উদ্বুদ্ধ সুভো ঠাকুর সেই কারণেই তো আজ—অসমীয়াদের দ্বারা যে এরূপে অমানবিক অশালীনতা সম্ভব—তা কিছুতেই বিশ্বাস কোরে উঠতে অক্ষম।

সভ্যজগতের বহির্ভূত অরণ্যের আইনেও অননুমোদিত এমন কি পাশবিকতাকেও পশ্চাত প্রদর্শনকারী এতদপ্রকার ক্রিয়া-কলাপের লোমহর্ষক কাহিনী পন্থের পন্থায় দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রত্যাখ্যান কোরতে ও' আজ তাই একান্তরূপেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

উপসংহারে এ ব্যাপারে সুভো ঠাকুর এবার অসম ও বাংলার সর্বক্ষেত্রের শিল্পীদের আহ্বান জানায়—তাঁরা এবম্বিধ নৃশংস ঘটনা চিরতরে পরিনির্বাণের কারণে একত্রে মিলিত হোয়ে অগ্রসর হউন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রমাণ করুন নিজেদের। অনুসন্ধান ও সত্য উদ্‌ঘাটনে হেলিকপ্‌টারে হেলান দিয়ে নয়, পায়ে হেঁটে নিপীড়িত আহত মানবাত্মার হৃদয়লোকে স্পর্শ কোরে সক্রিয় সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গিতে শান্তিসেনার উপযুক্ত ভূমিকায় ভূমিষ্ঠ হোন।

সুভো ঠাকুর এ ব্যাপারে—শুভ বিশ্বাসে সুদূর বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণে উৎসুক। এসম্পর্কে সুভো ঠাকুরের ঐকান্তিক আবেদন যে, অবাঙ্গালীদের ঘানিতে যোতা হৃতযৌবন মৃতপ্রায় বলীবর্দদের দূত হিসেবে না পাঠিয়ে, বাংলা সরকার পাঠান না কেন শান্তি আনয়নের উদ্দেশ্যে দলাদলির ঊর্ধ্বে অবস্থিত আদর্শবাদী শিল্পী ও সাহিত্যিকদের এবং দেখুন না কেন তার ফলাফল কি হয়!

সুভো ঠাকুর জানে শুধু নয়, সুনিশ্চিত দৃঢ় প্রত্যয় তার যে, বাংলাদেশ থেকে প্রাদেশিকতা বর্জিত প্রগতিশীল শিল্পীবৃন্দ অসমের প্রাদেশিকতা বর্জিত প্রগতিশীল শিল্পীদের সঙ্গে মিলিত হোয়ে এক যোগে যদি গুণ্ডাদল-দলিত গ্রামাঞ্চল পরিভ্রমণের সুযোগ পায়—তবে সরকার অনুমোদিত বাক্যবাগীশ নেতাদের ময়দান-মথিত বক্তৃতার চেয়ে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে শতগুণ বেশী সফলকাম হোতে বাধ্য।

সুভো ঠাকুর এবার অসমের এবম্বিধ পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গের অনবদ্য কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য আলেখ্য উন্মোচনান্তে এই দ্বিতীয় দফা সম্পাদকীয়র সমাপ্তি সাধনের পক্ষপাতী। বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষার আদি অকৃত্রিম জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের উদার জনসাধারণ ও তথাকার মহান সরকার সম্পর্কেই এই অবতারণা।

বাংলা ভাষা নিয়ে অসমে অবস্থিত বাঙ্গালীদের এত দাবী দাওয়া কিসের এবং কেন?—পশ্চিমবঙ্গের সরকার ও সাধারণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সুভো ঠাকুরও আপাততঃ এ তথ্যের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে নেহাতই অপারগ।

বাংলাভাষার পিতৃভূমি পশ্চিমবাংলায়, সরকার থেকে সাধারণ্যে, বাংলাভাষারূপ ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতায় পক্ষপাতিত্ব তো দূরের কথা, কোনরূপ সহানুভূতি বা স্বীকৃতি কদাচ কখনও দেখিয়েছে বোলে তো দেখা যায় নি। এ সত্য বাংলা দেশের মহাবড় শত্রুও স্বীকার কোরতে বাধ্য।

তবে কেন, পার্টিশানের পর পররাজ্যে পরিণত—পূর্ববঙ্গ হোতে আমদানী বাঙ্গালী উদ্‌বাস্তুরা আজ, অসমীয়াদের এহেন ভাষার ভিত্তিতে উত্যক্ত এবং উদব্যস্ত কোরতে উদ্যত?

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী থেকে বেসরকারী যাবতীয় আবেদন নিবেদন, দরখাস্ত থেকে বরখাস্ত, এমন কি সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের চিঠিপত্রে অবধি কুত্রাপি বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হোয়েছে বোলে তো জানা যায় না।

এরপর অসমে বাংলা ভাষার দাবীদার বাঙ্গালীদের—"বোঙ্গালরা মনুহ না হয় ছাগলী"—যা যথার্থ বঙ্গানুবাদে দাঁড়ায়—বাঙ্গালীরা মানুষ নয় ছাগল (অর্থাৎ কিনা বেড়ার ফাঁক দিয়ে পরের জমির চারাগাছের মাথা মুড়োতে ওস্তাদ) একথা উল্লেখ করলে তারা কি খুব অন্যায় কোরেছে বোলব?

বাংলা ভাষার পিতৃভূমি খোদ পশ্চিমবঙ্গেই যখন সরকারী থেকে বেসরকারী সর্বত্রই বাংলা ভাষার প্রতি এহেন পরগাছার ন্যায় অবহেলা—তখন কোন সাহসে অন্যরাজ্য আসামে, সেই বঙ্গভাষার সরকারী প্রতিষ্ঠার দাবীতে আশ্রিত উদ্‌বাস্তু বা উদ্‌বৃত্ত বঙ্গসন্তানেরা এত দাপাদাপিতে উদ্‌গ্রীব?

আজ একথা পণ্ডিত থেকে পন্থ, কে অস্বীকার কোরবে যে, অসমের ব্যাপারে অধুনা সারা পশ্চিমবঙ্গের সরকার ও জনসাধারণ পুনরায় সারা ভারতের সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হোয়ে দণ্ডায়মান।

একদা অতীতে প্রবাদ প্রচলিত ছিল—যে, 'বাংলা যা আজ চিন্তা করে, সারা ভারত তা চিন্তা করে আগামী কাল'। আজ সে প্রবাদ বাক্য, আমাদের মহান মন্ত্রীমহোদয় থেকে পশ্চিমবঙ্গের আচম্বিতে গান্ধীবাদে জাগ্রত জনগণ তা বাস্তবে পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকারী হিসেবে সুনিশ্চিত সম্মানিত হবার দাবীদার!

অসমীয়া গুণ্ডাদের হস্তে মা-ভাই-বোনের মর্যাদা নিতান্তই মাটিতে মিশে যাওয়া সত্ত্বেও যে জাত বক্তৃতা, বিবৃতিদান ও আখ্‌বার-এ আস্ফালন কোরেই কর্তব্য কর্ম সমাপন হোয়েছে মনে কোরে ক্ষান্ত হয়—যে জাতের মহান এম. এল. এ. এবং মন্ত্রী মহোদয়গণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ন্যায় গদিতে নাছোড়বান্দা গদীয়ান হোয়ে কেবলমাত্র মুখনিঃসৃত প্রতিবাদের প্রভঞ্জনে আর ফতোয়া দানে ফতে কোরতে চান সব কিছু—লোকে বলে সে জাত চতুর হোতে পারে কিন্তু জাত হিসেবে যে কত ফতুর, তা আজ কারো কাছে নাকি আর অবিদিত নেই!

সুভো ঠাকুর কিন্তু উল্টোকথা বলে, ও বলে—পশ্চিমবঙ্গ আজ অসাধ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ কোরেছে। চাতুর্যের দ্বারা সে মহৎ কার্য শুধু যে সম্ভব কোরেছে তা নয়, কৃতকার্যতার সঙ্গে তার সকল সমস্যার সমাধানও কোরেছে।

যে জাতের মা বোনের চরম লাঞ্ছনার পরেও ছাত্র-আন্দোলন আজ শান্তিপূর্ণ হরতাল এবং কুশপুত্তলিকা দাহতেই সীমাবদ্ধ, যে জাতের তুরীয়লোক-তোষণ সাধনায় কৈবল্যপ্রাপ্ত নেতৃত্ব সদাই ইন্দ্রপ্রস্থের ক্ষেত্রজ সন্তানদের সম্মুখে, গরুড়পক্ষীর ন্যায় হাঁটুগেড়ে—সেই দেশে দেশে নন্দিত বঙ্গদেশের এহেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ কীর্তি, ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের অন্য কোথাও কখনো কেউ দেখিয়েছে বলে তো বোধ হয় না!

তবু চাচা নেহেরুর এলোপাথাড়ি ছি-ছি—আজও, সততই কারণে অকারণে সতাতো ভাই-এর সন্তানের ন্যায়, একমাত্র বঙ্গদেশের কপালেই কোনো না কোনো ছুতোয়, বে-কসুর ছিটকে পড়তে সব সময় যেন পা বাড়িয়ে।

তাই বুঝি, এবারে বাংলাদেশে মুখ্য থেকে মূর্খ সব খেলোয়াড়ই, নেহেরুর পিঠচাপড়ানো রূপ শীল্ড—যেনতেন প্রকারেণ নিশ্চিৎ আদায় করতে বদ্ধপরিকর। নতুবা অবাঙ্গালীর চক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীদের সত্যিই আজ এবম্বিধ উঁচুস্তরে ওঠার এতো তাড়াতাড়ি

এতো বাড়াবাড়ি হ্যাংলাপনা আর হুড়োহুড়ির কারণ কী? বঙ্গদেশের নেতা ও সরকার একজোটে আজ অবাঙ্গালীদের নিকট নিজেরা কত সুন্দর আর কত মনোহর—তাই প্রমাণ কোরতে প্রতিযোগিতায় যেন ঘোড় দৌড়ের মাঠে নেমেছে। প্রাদেশিকতার পাশবিকতার কত ঊর্ধ্বে তাঁরা অবস্থিত—একথার বিজ্ঞাপ্তি আজ তাই বুঝি, বাংলার আকাশে বাতাসে! আর তাই বুঝি, সামান্যতম অজুহাতেই স্বজাতীয় ব্যক্তিবৃন্দকে বন্দুক মারফৎ সম্ভাষণ জানাতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধাবোধ নেই?

এছাড়া বাঙ্গালী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন তো আছেনই। আজ নেহাৎই সম্রাট অশোকের ন্যায় উচ্চাদর্শের গরিমাময় উচ্চাসনে তিনি আসীন! খবরের কাগজ মারফৎ শোনা যায়—তাঁর অসম সাফারির প্রাক্কালে, অসমে অত্যাচারিত বাঙ্গালীদের বেদনায় উদ্বুদ্ধ হোয়ে, তিনি নাকি মাড়োয়াড়ী ছাত্রাবাসে গমনপূর্বক অ-বাঙ্গালী ছাত্রদের সেবায় নিযুক্ত হোয়েছিলেন। অসমে অসমীয়াদের দ্বারা অত্যাচারিত বাঙ্গালীদের প্রাদেশিকতার প্রায়শ্চিত্ত রূপ তাঁর উপরি উক্ত সেবা কার্য কেবলমাত্র মহাত্মা করমচাঁদের করণীয় কর্তব্যের সঙ্গেই তুলনীয়।

এরপর সুভো ঠাকুরের ভবিষ্যৎ-বাণী অনুযায়ী—পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ মুখ্য মন্ত্রীত্ব তাঁর আর কেউ কি রোধ কোরতে পারে?

এমতাবস্থায় তাঁর প্রতি বাঙ্গালী জনসাধারণের ও বাংলার সংবাদপত্রের বুদ্ধিহীন বিদ্বোদ্গারের বিশ্লেষণে সুভো ঠাকুর বলে—নোয়াখালির ন্যায় অসমে মহাত্মার ভূমিকায় অবতীর্ণ কেন্দ্রীয়মন্ত্রী অশোক সেন মহাশয়ের গোড়ায় গলদ! গলদ কিন্তু তাঁর একমাত্র পোষাক ও আসাকের ব্যাপারেই—বুলিতে নয়! একদা উদ্দেশ্য-সাধনে তিনি অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার কোরেছেন। শোনা যায় স্বয়ং ঝাড়ু হস্তে উত্তর কোলকাতার বিশেষ পল্লী-পথ তিনি সমাজ সেবার খাতিরে ঝাঁট দিয়েছেন। এবারেও তার দেশের ও দশের খাতিরে তাঁর পোষাক, চেহারা ও ভাবভঙ্গীর কিঞ্চিত ভোল বদলালেই তো স্বচ্ছন্দে সকল দুর্ঘটনার অবসান হোতো। হোতো সকল হাঙ্গামার অবশেষ। মস্তক মুণ্ডন পূর্বক সামান্য একটু চৈতন রেখে, একটি রাম-ছাগল সহ মুখে সর্বদা রামধুন সঙ্গীত ও হাটুর উপর মালকোচ্চা-মারা ধুতি হোলেই তো ব্যাস্—এর পর আর দেখে কে? তাঁর কুশপুত্তলিকা থেকে বৃষকাষ্ঠদাহ দূরের কথা—মাড়োয়াড়ী মহল মহাত্মার পুনরাবির্ভাব মনে কোরে তাঁকে মাথায় তুলে নাচতো। আর বাংলা খবরের কাগজগুলোও সমানে পাল্লা দিত তার সঙ্গে।

কিন্তু হায়! এতো কোরেও প্রার্থনারত বাংলাদেশ নেহেরুর নিকট পাদোদকের পরিবর্তে কেবলমাত্র কাবুলী স্যাণ্ডেল সহ পদাঘাতই পুরস্কার পেল। যেখানে খুনী আসামীরাই হোল 'ফাইন ম্যান'।

অসমের ব্যাপারে নেহেরুর শান্তি আনয়নের প্রচেষ্টা সুভো ঠাকুরের সুপারিশে নোবেল-পিস্-প্রাইজ পাবার দস্তুরমত সম্ভাবনা রাখে!

গুজবে বলে—অসমে বাঙ্গালী ব্যতীত ব্যবসায় ও বাণিজ্যে ব্যাপৃত অন্য আরও একটি অন-অসমীয় সমপ্রদায়ও পরোক্ষে পেট্রোল এবং লরী দ্বারা সাহায্য কোরে প্রকারান্তরে বাঙ্গালীদের হত্যা এবং উৎখাতের ব্যাপারে উৎসাহিত কোরে ছিল। বলা বাহুল্য, উপরি উক্ত একই ব্যবসায়ী অবাঙ্গালী সম্প্রদায়—এই 'সোনার বাংলা'র বুকে বোসে বহুকাল ধরে শ্মশ্রু উৎপাটনে উৎসাহী। একথা সর্বজন স্বীকৃত—যে বাংলার রক্তে পুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের বা বাঙ্গালীদের সৌন্দর্য-শিল্প-সাংস্কৃতিক কোনো ব্যাপারেই এই সম্প্রদায়ের সাহায্য, উৎসাহ বা পৃষ্ঠপোষকতা আজ অব্দি নিছক নেতিবাচক। বাংলার বুকের উপর এই সম্প্রদায়ের অর্থ শোষণকারী বিরাট অফিসগুলির কর্ম কেন্দ্রেও রুজি-রোজগারকারী বাঙ্গালীরা অচ্ছুতরূপে পরিগণিত। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশই এক পুরুষের অধিকাল হোতে এই দেশের অধিবাসী শুধু নয়—অর্থে, রক্তে এবং দুগ্ধে পুষ্ট। এই বাংলাদেশের দুধ-কলা খাওয়া পরদেশী কালসাপরা এমনকি বাংলা ভাষা শিখতেও অনিচ্ছুক। বাঙ্গালীদের পোষাক-আসাক, আহার-বিহার, কথা-বার্তা আজ অবধি কোনো কিছুই গ্রহণ না-কোরে কেবল অর্থ শোষণেই নিজেদের কর্তব্য কর্ম সমাপনান্তে বাংলার বুকে-বিদ্ধ শূলের মত চক্ষুশূল হোয়েই তারা বর্তমান। আজ, বালীগঞ্জ থেকে বাগবাজার, টালীগঞ্জ থেকে টালা—যেখানে যত বনেদি বাড়ী, যেখানে যত সেরা জমি, সব এই সম্প্রদায়ের করতলগত। কালো-বাজারী অর্থের দাপটে বাংলার মন্ত্রীত্ব এদের মুঠোর মধ্যে। মুখ্য থেকে মূর্খ সব খেলোয়াড়ই এই সম্প্রদায়ের হাতের চেটোয় আপাতত পুতুল-নাচে রত।

অসমে বাঙ্গালী বিদ্বেষের বিরাট পর্ব আজ সিনেমা প্রেক্ষাগৃহের ইণ্টারভ্যালের মত কিছুকালের জন্য বিরতি লাভে ধন্য। এই স্থগিতের সুযোগে সুভো ঠাকুর অসমকে এবং অসমীয়াদের শিক্ষাগুরুর পদে বরণ কোরে প্রণাম জানাচ্ছে। এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালীদের উদ্দেশে ও' আহ্বান জানাচ্ছে—অন্ধ্র, গুজরাট, মহা-রাষ্ট্রের যে পাঠ পঠন পূর্বক অসমীয়ারা আজ 'ফাইন ম্যান'-এ পরিণত, সেই পাঠ অসমীয়াদের কাছ থেকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করুক আজ বাঙ্গালীরা। আর তবেই তো নেহেরুর নিকট 'ফাইন ম্যান' হবার স্বপ্ন একমাত্র সম্ভব হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়।

বাঙ্গালী বারে বারে দিকে দিকে যদি এমনিতরই উৎখাত হয়, তবে কাছাড় এবং গোয়ালপাড়া পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে কোলকাতার উপরি উক্ত অ-বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের বালিগঞ্জ থেকে বাগবাজার এবং টালিগঞ্জ থেকে টালার প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক সর্বপ্রথম। মনে হয় অন্য প্রদেশ থেকে উৎখাত-হওয়া বাঙ্গালীদের পুনর্বাসনে সে অট্টালিকাগুলি পরিসরের দিক দিয়ে নেহাৎ অপরি-সর হবে না।

মাসিক পত্রের কথা

বুদ্ধদেব বসু

পুরাতনী

আজকাল দেখতে পাচ্ছি বাঙলাভাষায় পড়বার মত মাসিকপত্র একটিও নেই, পড়বার মত মানে এই বুঝি যে পত্রিকা প্রকৃতই সাহিত্যিক, যার স্বকীয়তা আছে, নিজস্ব একটী সুর আছে, যা একবার চোখ বুলিয়ে ফেলে না দিয়ে হাতের কাছে রেখে আস্তে আস্তে রসিয়ে রসিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। সাময়িক পত্রাদি যদি দেশের আবহাওয়ার কোনো সূচনা হয় তা হ'লে একথা বলতেই হবে যে আমাদের সংস্কৃতির ক্রমশই অধঃপাত হচ্ছে। মাসিকপত্রের সংখ্যা কমে' গিয়ে সাপ্তাহিকগুলি ভয়ানকরকম বেড়ে চলছে; এগুলোর প্রধান রসদ সিনেমার ছবি ও চার্টান, এগুলোর প্রধান উপজীবিকা সিনেমার বিজ্ঞাপন। এবং ওতে পঠিতব্য বস্তু যা থাকে, তা জ্বরে সময় কাটাবার উপলক্ষ, হিসাবেও পড়া সম্ভব নয়। অতিশয় খেলো, অতিশয় জোলো, বুদ্ধিহীন অস্থি-হীন রচনা নিয়েই এদের পসার। সত্যিই কি সিনেমা দেশের সমস্ত ভালো জিনিসকে হত্যা করে' ফেললো?

মাসিকপত্রের মধ্যে টি'কে আছে অবিশ্যি বিশ্বসার সংগ্রহ বিপুলবপু কয়েকটি। প্রবাসী এদের মধ্যে এখনো খানিকটা অভিজাত বলে' কথিত। এখন পর্যন্ত সমস্ত বাঙলা সাময়িকপত্রের মধ্যে প্রবাসীর উপরেই রবীন্দ্র-নাথের পক্ষপাত। বিচিত্রায় মাসে মাসে রবিঠাকুরের কবিতা বেরোয়, প্রবাসীতেও বেরোয়; কিন্তু ও-দুয়ে তফাৎ অনেক। রবীন্দ্রনাথের অনুকম্পা ও রামানন্দবাবুর সম্পাদকীয় মন্তব্যের জোরেই প্রবাসী এখনো বৈশিষ্ঠ্যের দাবী করতে পারে; তা ছাড়া অন্য যা ভালো লেখা—ও কাগজে বেরোয় তা নেহাৎই দৈবাৎ। মোটের উপর প্রবাসীও অম্নিবাস পত্রিকা মাত্র; নিজের কোন সুর নেই, নিজের কোনো সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই; ধর্ম রাজনীতি ও সামাজ-সমস্যার সঙ্গে দুটো চারটে 'নির্দোষ' গল্প মিশিয়ে গণ-মনের তুষ্টিসাধনই এর উদ্দেশ্য। এতে সাহিত্যিক মনের তৃপ্তি হয় না। বিচিত্রার প্রথম দিকটায় বেশ একটা সাহিত্যিক আবহাওয়া ছিলো —সবুজপত্রের ছিটকে পড়া ছিন্নদল নিয়ে হয়েছিলো বিচিত্রার পাতাবাহারের রচনা। কিন্তু সম্প্রতি ও পত্রিকার কেন যে এমন দুর্গতি হ'লো ভেবে পাইনে। পরিচয় কি অনেক লেখক ও লেখা কেড়ে নিয়েছে? কিন্তু পরিচয়ের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; বিচিত্রার সঙ্গে তার কলিশন হবে কোথায়? আজকাল বিচিত্রার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে মনে হয় যে-কোনো লেখা সম্পাদকের দফ্‌তরে আসে তা-ই ছাপাখানায় চলে' যায়। শরৎবাবুর ভূত ভাঙিয়ে আর কতদিন চলবে? দেশে নিতান্তই যে দু'চার জন লিখতে পারেন তাঁদের লেখা সংগ্রহ করতে বিচিত্রার কর্তৃপক্ষ এত বিমুখ কেন? আর ঐ যে পাইকা অক্ষরে ছাপা ত্রিশ চল্লিশটি পদ্য প্রতি মাসে স্থান পায়, তার বদলে ফর্মা দুই সাদা কাগজ দিলেও তো পাঠকদের ছেলেপুলেরা হস্তাক্ষর অভ্যেস করতে পারে। বিচিত্রার সঙ্গে একজনের নাম জড়িত আছে যাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি; তিনি চেষ্টা করলে হয়তো ওর চেহারা ফেরাতে পারেন; কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই কি দেরি হ'য়ে যাচ্ছে না।

ভারতবর্ষ আর বসুমতী সম্বন্ধে এখানে কিছু বললাম না, ওদের সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই। ওরা ওজনে সব চেয়ে বেশি, কার্টাতে সব চেয়ে বেশি; এবং ডিপ্‌টিগিন্নি রেলের বাবু ও দোকানদারের পড়বার মত দু'একটা কাগজ দেশে থাকাও দরকার। এ ধরণের মাসিকপত্র সব চেয়ে বেশি চলবে এতে অবাক হবার কিছু নেই; তবে অন্য কোনো ধরণের কিছুই যে চলছে না, তার জন্যে আক্ষেপ না করে পারিনে। প্রকৃতই যারা সাহিত্য ভালোবাসে তাদের পড়বার মত কাগজ একখানাও কি দেশে টি'কতে পারলো না? অথচ আমরাই না বাঙলাদেশের সাহিত্য নিয়ে কত গর্ব করি!

২

দেশের এতটা দুর্দশা অবশ্য সেদিন পর্যন্তও হয়নি। একটু আগে থেকেই বলি। আমি যে সময়টায় প্রথম লেখার বাজারে প্রবেশ করি, কল্লোলের তখন চরম দিন। ছিলো গল্পের হালকা কাগজ, সিকির ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া হ'তো—কয়েকটি মানুষের দৈব পরিচয়ের যোগাযোগে হ'য়ে উঠলো নতুন লেখকদের বাহন। এ-কথা জোরকরেই বলবো যে একটা সময়ে কল্লোল যে-আদর্শে পৌঁছেছিলো ও বছর দুই ধরে তা অক্ষুণ্ণও রেখেছিলো এ-দেশে তা সত্যিই বিরল। এ-কথা বলবার মানে এ নয় যে সে-সময়ে কল্লোলেপ্রকাশিত সমস্ত রচনাই উৎকৃষ্ট হ'তো। কিন্তু কল্লোল ছিলো নতুন পরীক্ষার ক্ষেত্র, ছিলো নির্ভয় ও আত্ম-নির্ভর; কল্লোলের উপলক্ষে নবসাহিত্যের একটি বিশিষ্টদল গড়ে উঠেছিলো সেটাই মস্ত কথা। দেশের সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে ও চালিয়ে রাখতে এ-ধরণের পত্রিকারই সব চেয়ে বেশি দরকার। কালি-কলমকে কল্লোলেরই একটি শাখা বলে' ধরতে হবে; এবং তাতেও যখন কুলোলো না, ঢাকা থেকে প্রগতি বেরুলো। সে সময়কার উৎসাহে অনেক কাঁচা জিনিস স্থান পেয়েছিলো সন্দেহ নেই; কিন্তু এ ও নিঃসন্দেহ যে বাঙলাদেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রে অমন উৎসাহের অভ্যাগমও এ পর্যন্ত আর দেখলুম না।

কল্লোলের লুপ্তির মত শোচনীয় ঘটনা আমি সম্প্রতি আর কিছু মনে করতে পারিনে। কালি-কলম আর প্রগতির উঠে যাওয়ার কারণ হয়তো একই; কিন্তু শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ মহাশয় কল্লোলকে ঠিক এমন সময়েই ছাড়লেন যখন সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। হয়তো দীনেশবাবু নিজে সাহিত্যচর্চায় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, সেটা বিশ্বাস করতে আমি খুবই প্রস্তুত। তবে কল্লোল যদি এখন পর্যন্ত চলে' আসতো (এবং সেটা মোটেও অসম্ভব ছিলো না), তাহ'লে আজকের দিনে আমাদের সকলেরই গৌরবের বিষয় হ'তে পারতো।

কিম্বা হয়তো কল্লোল এতদিনে ছ'টাকা দামের জাঁদরেল ডবলডেকারে পরিণত হতো; সুতরাং উঠে গিয়েই হয়তো ভালো হয়েছে, কে জানে! কল্লোলের পরে পর পর আরো কয়েকটি সাহিত্যপত্রের সঙ্গে

আমি পরিচিত হয়েছিলাম; বিশেষ কয়েকজন লেখকের সহযোগিতায় সে-সব পত্রিকায় ছিলো রূপের ও রসের স্বকীয়তা। তার মধ্যে প্রথমে প্রবাসী বাঙালীর মুখ-পত্র উত্তরার নাম করবো। পত্রিকা পরিচালক হিসেবে শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্তীর কৃতিত্ব যে কতখানি তা এই বললেই বোঝা যাবে যে এতগুলো বছরের মধ্যে তিনি নিজের কোনো লেখা তাঁর কাগজে ছাপেননি। এবং নতুন কোনো ভালো লেখকের রচনা প্রকাশ করবার আগ্রহ তাঁর মধ্যে বরাবর লক্ষ্য করেছি। সম্পাদকের পক্ষে এটা মহৎ ও দুর্লভ গুণ। এবং সে বিষয়ে তাঁর মধ্যে কোনোরকম সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাও ছিলো না। মোহিত মজুমদারের অনেক ভালো কবিতা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনেক ভালো গল্প—তা ছাড়া আধুনিক খ্যাত-নামাদের সকলেরই ভালো ভালো লেখা পুরোনো উত্তরা ঘাঁটলে পাওয়া যাবে। আমার যতদূর ধারণা, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় উত্তরারই মারফৎ। এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ-স্বাভাবিক অদ্ভুত গল্প প্রথমে ছাপতে একটু সাহসেরই দরকার। শ্রীযুক্তা আশালতা সিংহের যা দু'একটী ভালো গল্প বেরিয়েছে তাও উত্তরারই পৃষ্ঠায়। কপালগুণেই হোক্ আর চেষ্টা করেই হোক্, উত্তরা এককালে—শুধু মুদ্রণ পারিপাটো নয়, আভ্যন্তরীণ বস্তুতেও বাঙলা মাসিকের মধ্যে সত্যি শ্রেষ্ঠ ছিলো। কিন্তু সে কাগজও উঠে গেলো। খাঁটি সাহিত্যের কোনো কাগজই যেন দুর্ভাগা দেশে টিঁকতে চায় না।

আর একটি পত্রিকা ছিলো স্বদেশ; স্বদেশের উপর কেমন একটা মায়াই পড়ে গিয়েছিলো আমার। অত অল্প সময়ে অতখানি প্রভাব ও প্রচার স্বদেশের এই কারণেই হয়েছিলো যে আধুনিক লেখকরা প্রথম থেকেই সে কাগজে মিলেছিলেন। স্বদেশের প্রথম পর্যায়ের সংখ্যাগুলো সত্যি উল্লেখযোগ্য; ঐ উৎকর্ষ বজায় রেখে চালিয়ে আসতে পারলে এতদিনে তার প্রাধান্য অনস্বীকার্য হ'তো। কিন্তু বড় আকস্মিকরূপেই স্বদেশে মারা গেলো।

আর একটি মাসিক ছিলো পূর্বাশা। কুমিল্লার কয়েকটি উৎসাহী ও সাহসী যুবকের প্রচেষ্টা এ। প্রথম বছর কুমিল্লাতেই গোপন থেকে দ্বিতীয় বর্ষে এ কলকাতায় আত্মপ্রকাশ করেছিলো। তারপর নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে কেবল সংকল্পের জোরেই দু'বছর ধরে' যে ভাবে এর পরিচালকরা একে চালিয়ে গিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও শ্রদ্ধেয়। পূর্বাশার পিছনে একটা আদর্শ ছিল—সে আদর্শের যথার্থ রূপায়ন সব সময় সম্ভব না হ'য়ে থাকলেও দোষের নয়। পূর্বাশার সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রথম থেকেই; এবং আমার খুবই আশা ছিলো যে সকল বাধা বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে একদিন এ পত্রিকা নিজেরই শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে, হবে বাঙলা ভাষার একটি আদর্শ-অনুপ্রেরিত প্রকৃত সাহিত্যপত্র। কিন্তু আমার সে-আশা বড় রূঢ়ভাবেই ভাঙলো। সম্প্রতি বাজারে সাপ্তাহিক পূর্বাশা বেরিয়েছে, মাসিক উঠে গেছে। মাসিক পূর্বাশা ছিলো শ্রদ্ধেয়; সাপ্তাহিক পূর্বাশা অবজ্ঞেয়। জানি না এতে কি দেশেরই দুর্দশা সূচিত হয় না কি বোঝা যায় পূর্বাশা পরিচালকদের নিষ্ঠার অভাব।

৩

যা-ই হোক্, এ পর্যন্ত দেখলাম একটি সাহিত্যপত্রও বাঁচলো না। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সম্পাদকের অবহেলা কি অক্ষমতা না ঘটেছে এমন নয়; তবু মনে হয় আমাদের জনসাধারণ আজকাল মনের দিক থেকে এমনই দরিদ্র ও হীন যে একটী সাহিত্যপত্রকেও তারা বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। দেশে সিনেমা ও সিনেমা-সংক্রান্ত ইম্বেসিলিটী ছাড়া কিছুই যেন চলে না। সাহিত্যের পাঠকরা সাধারণভাবে এমন উদাসীন বুদ্ধি-হীন নিঃসাড় ও জড় আর কখনো হয়েছে বলে' মনে হয় না। কোথাও কোনো মাপ নেই, মান নেই; ভালো-মন্দ বিচার করার আগ্রহ কি চেষ্টা লোপই পেয়েছে; বরঞ্চ শস্তা পারিসিটীর কতগুলো কায়দাই আজ-কালকার সাহিত্যের বাজারে চলতি। এ সঙ্কটের প্রধান সহায় একটী স্থিরলক্ষ্য দৃঢ়বুদ্ধি সংস্কৃতিবান মাসিক-পত্র—যা বরাবর একটা আদর্শ বজায় রেখে চলবে এবং সেই আদর্শে পাঠকের চিত্তকেও উদ্বুদ্ধ করবে। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, কোনটা মেকি কোনটা খাঁটি সেটা রচনায় ও সমালোচনায় বুঝিয়ে দেয়া ভালো সাহিত্য-পত্রের সর্বপ্রধান সাধনা। সে ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক পরিচয় কিছু হয়তো করতে পারতো যদি না স্বদেশের সাহিত্যের উপর তার এমন মজ্জাগত একটা অবজ্ঞা থাকতো। পরিচয়ের আওতায় কোনো নতুন সাহিত্য-শিল্পীর সৃষ্টি এপর্যন্ত হয়নি। পরিচয়ে যে শ্রেণীর বিদেশী গল্পের তর্জমা বেরোয়, সে রকম কি তার চেয়ে উৎকৃষ্ট গল্প লিখতে পারেন, বাঙলাদেশে এমন দু'একজন লেখক আছেন; কিন্তু তাঁদের কোনো গল্প পরিচয়ে দেখা যায় না। পরিচয়ে বিদেশী গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা থাকে, কিন্তু অনেক ভালো বাঙলা বই উল্লিখিতই হয় না কি 'সংক্ষিপ্ত' রূপে উল্লিখিত হয়। নিজের সাহিত্যের প্রতি এ অবজ্ঞা আমি অন্তরের দৈন্যসূচকই মনে করি। যে পত্র বাঙলাভাষাতে লেখা হয়, অথচ বাঙলাসাহিত্যকেই স্বীকার করে না, তার সার্থকতা যে কী ঈশ্বরই জানেন।

মাসিকপত্রের আলোচনায় পরিচয়ের উল্লেখ করলাম এইজন্যে যে বর্তমানে ঐ আমাদের একমাত্র সাহিত্যপত্র। কিন্তু একটী মাসিকপত্রের বড় প্রয়োজন, যা সাহিত্যকে স্ব-সার্থক মনে করে, এবং বাঙলা ভাষার লেখকদের আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের ক্ষেত্র হওয়াই যার উদ্দেশ্য। এ রকম পত্রিকা শিগগির হবে কিনা এবং হ'লেও চলবে কিনা ঈশ্বরই জানেন।

সাংবাদিক প্রফুল্ল মিত্র মহাশয় একটি নাতিবৃহৎ পত্রসহ শ্রীকালী-প্রসন্ন দাশ মহাশয় সম্পাদিত বাংলা ১৩৪২ সালে প্রকাশিত 'বলাকা' নামক একটি পত্রিকার 'বসন্ত সংখ্যা' সুন্দরম্ সমীপে প্রেরণ করেন।

উক্ত 'বলাকা' নামক পত্রিকার চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রবন্ধে স্বর্গীয় কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের তদানীন্তন ও এখনকার মতামতের 'অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের' উল্লেখই মিত্র মহাশয়ের সে পত্রের সারমর্ম। এতদ্ব্যতীত কোনো নতুন তথ্যের সন্ধান দিতে না পারায় সে পত্রটি আমাদের ঔৎসুক্য আনয়নে একান্ত অক্ষম এবং সেই হেতুই এক্ষণে অনাবশ্যক বিধায় এস্থানে অবশ্যই তাহা উহ্য রাখা হোলো।

তবে শ্রীমিত্রের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতার অবধি নেই কারণ, যে অখ্যাতনামা পত্রিকায় প্রকাশিত এই মূল্যবান প্রবন্ধটি লোক চক্ষুর অন্তরাল থেকে তিনি দিবালোকে ন্যূনাধিক পঁচিশ বছর পরে টেনে বের কোরতে সক্ষম হোয়েছেন।

মানুষের মত কিছু চিরন্তন নয়। তাই, পঁচিশ বছর পূর্বের মত পঁচিশ বছর পরেও যে টিকে থাকবে এমন মাথার দিব্য দেওয়ার স্পর্ধা একালে কারুর থাকতে পারে বোলে তো বোধ হয় না। সেই কারণে শ্রদ্ধেয় শ্রীবুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের তদানীন্তন ও এখনকার মতামতের অসামঞ্জস্যের অবতারণা এখানে নিতান্তই অবান্তর।

তবে সুন্দরম্ আজ তার এই 'পুরাতনী' বিভাগে উপরি উক্ত প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণে অকাট্য আনন্দলাভে ধন্য। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের পঁচিশ বছর পূর্বের তীক্ষ্ণধীকলমের বলিষ্ঠতার পরিচয়ে এ যুগের পাঠকবৃন্দ সুনিশ্চিৎ আশ্চর্য ও বিমুগ্ধ হবেন একথা সুন্দরম্ সম্পাদক দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করে বলেই প্রবন্ধটির এখানে পুনঃ প্রকাশের এই ব্যবস্থা।—সুন্দরম্ সম্পাদক।

আলোর কান্না

দিলীপ মিত্র
নবীন লেখক। অখ্যাত হোলেও শক্তিমান।
সবে গল্প ইত্যাদি প্রকাশিত হোতে সুরু হোয়েছে।

আমার বন্ধু আর্টিস্ট শুভময় ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেদিন একরকম নাটকীয় ভাবেই। পনের-ষোলো বছর কোন দেখা সাক্ষাৎ নেই। আর এই ইহ-জগতে যে দেখা পাব এ আশাও কোনদিন করিনি।

তবু দেখা পেলাম।

সরকারী কাজে দিল্লী যেতে হয়েছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লালকেল্লা দেখে ফিরছিলাম। মনে মনে ভাবলাম, একটু হেঁটেই এ দিকটা দেখা যাক। পথচারী হয়ে রথচারীদের দেখতেও যে মন্দ লাগেনা সেটা সেদিন খানিকটা অনুভব করলাম। বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের পালাই-পালাই ভাব! রাস্তার ফুটপাথে একজন অন্ধ ভিক্ষুক গান গাইছে; চলমান দিল্লীর নেপথ্যের এই গানটুকু বেশ লাগছিল!

কিন্তু একটু হাঁটতেই সুরু হল আঁধি! নাকে রুমাল চেপে তাড়াতাড়ি ছুটতে আরম্ভ করলাম। কিছুটা যেতেই দেখলাম একটা খাবারের দোকান। আমার ভাগ্য ভালো, দোকানের মালিকও দেখলাম বাঙ্গালী।

এসে আশ্রয় নিলাম দোকানের মধ্যে। বাইরে চলছে তখনো আঁধির খেলা। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম বাইরে।

দোকানের মালিকের চোখ তখন ক্যাসবাক্সের দিকে। দুআনি, সিকি, আটআনি, এগুলো সব সাজিয়ে সাজিয়ে রাখছেন। এর মধ্যেই আমাকে বোধহয় একবার দেখে নিলেন। তারপর গলাটা সপ্তমে চড়িয়ে একজন বয়কে বললেন, কিরে বোসে বোসে ঝড় দেখছিস নাকি? তোদের নিয়ে তো মহাজ্বালায় পড়লাম দেখছি। জিগগেস কর—কি লাগবে-না-লাগবে!

একটু হেসে বললাম, পেটের তাগিদে নয়, প্রাণের তাগিদে ঢুকেছি আপনার এখানে। আচ্ছা এক পেয়ালা চাই দিন।

একটি অল্পবয়সের ছেলে তখনও বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। রেগে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন, এই গোপলা তোর ঝড় দেখা আমি বের করে দেব একটি চড়ে। খদ্দের দেখার নাম নেই, উনি ঝড় দেখছেন। ফাজিল কোথাকার। ঝড় দেখলে পেট ভরবেনা। যা-যা, কাজে যা।

ছেলেটি চলে গেল। উনি আবার ক্যাস-এ মন দিলেন।

চা খেয়ে পয়সা দেবার জন্য ক্যাস-এর কাছে এগিয়ে গেলাম। মনটা যেন হঠাৎ কেমন সন্দিহান হয়ে উঠল। মনে হল, কোথায় যেন দেখেছি ভদ্রলোককে। অত্যন্ত

পরিচিত মুখ। তথচ কিছুতেই মনে করতে পারছিনা। মনের তখন একটা বিশ্রী অবস্থা!

খুচরো ছিল না। একটা আধুলি দিলাম। উনি দুতিনবার আধুলিটাকে হাতের ওপর ঘসলেন। বললেন, এটা পাল্টে দিন। ভালো মনে হচ্ছে না।

বাধ্য হয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট বের কোরে বললাম উপায় নেই!

—ছ' পয়সার চা খেয়ে পাঁচ টাকার ভাঙানী। ওঁর কণ্ঠে বিরক্তির সুর! পয়সা দিতে দিতে বললেন, গুণে নিন, গুণে নিন!

বললাম, আপনি কি আমায় ঠকাবেন?

—কিন্তু আমি তো ঠকে যেতে পারি। যদি ভুল করে বেশী দিয়ে ফেলি। দেখুন তো আগের খুচরোগুলো ভালো করে। একটা দু'আনি কম পড়ছে কেন?

পয়সাগুলো সব সামনে দিলাম। গুণে বললেন, না, আমারই ভুল হয়েছিল।

আমি কিন্তু এতক্ষণ ধরে ভদ্রলোককেই দেখছিলাম। চোখের কাছে কাটা দাগটা আমার সন্দেহকে যেন আরো বাড়িয়ে তুলল!

বললাম, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিগগেস করব?

—করুন।

—আপনার নাম কি বলুন তো? খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

—শুভময় ঘোষ। ফরিদপুরে বাড়ী। অবশ্য আমি অনেকদিন দেশছাড়া!

ভদ্রলোক এবার আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু আমি তখন ভাবছিলাম অন্যকথা। আমার বন্ধু আর্টিষ্ট শুভময় ঘোষ তো নিরুদ্দেশ। শুনেছিলাম মারা গেছে। অবশ্য পরে আর ওর সম্বন্ধে কোন খোঁজই রাখিনি। আমিও অনেকদিন বাংলাদেশ ছাড়া। মনের সন্দেহ তখনও আমার যায়নি। বললাম, আপনার বাবার নাম কি হরেন ঘোষ। যিনি ফরিদপুরে উকিল ছিলেন?

ভদ্রলোক আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ। আপনি তো আমার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন দেখছি!

এবার আর আপনি, তুমি নয়! তুই। পরিচয় দিলাম।

বললাম, তোকে তো চেনাই যায় না। আমি তো জানতাম, আর্টিষ্ট শুভময় ঘোষ অনেকদিন আগেই মারা গেছে। সেই যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলি, তারপর থেকে তোর কোন খোঁজই নেই।

একটু হাসল শুভ! কেমন যেন ম্লানহাসি। বলল, নিরুদ্দেশ তো আমি আজও!

কোন জবাব দিলাম না কথাটার। চুপ করে রইলাম। ভাবছিলাম, আজকের কথা নয়। পনের বছর আগের কথা।

সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাইটা জ্বাললাম।

শুভ কিন্তু এককালে খুব উঁচুদরের চিত্রশিল্পী ছিল। ছবিই ছিল ওর ধ্যান-জ্ঞান। ও ছবি আঁকত, আর আমি লিখতাম ছন্দ মিলিয়ে কবিতা। যতবার পাঠাতাম ততবারই ফেরৎ আসত। সম্পাদকদের শ্রাদ্ধ করতাম। রেগে বলতাম, দূর দূর কবিতা বিচার করার মত ক্ষমতা এদের নেই। শুভর ছবি তখন বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় বেরুচ্ছে! দৈনিক পত্রিকার নিজস্ব কলা সমালোচকের ওঁর সম্বন্ধে প্রশংসাপূর্ণ আলোচনা প্রায়ই বের হোতো। শুভ তখন আমার কাছে সম্পূর্ণ অন্য জগতের লোক। বিরাট প্রতিভার অধিকারী! আমার চোখে—ভবিষ্যৎ-এর ভ্যানগগ্!

মাঝে মাঝে আমার কবিতা ওকে দেখাতাম। কেমন-তরো যেন হাসতো। বলতো, লিখে যা। এখনও তোর হাত পাকেনি।

অস্বীকার করব না, মনে মনে খুব রাগ হত। ভাবতাম কী অহংকারী ছেলেরে বাবা। নয়, একটু নামই করেছিস। এত দেমাক ভালো নয়। মনে মনে হয়ত ওকে আমি ঈর্ষাই করতাম। সহরের সবার মুখে তখন শুভর নাম। পরিচিতরা ওকে ডাকতো আর্টিষ্ট বোলে।

যতই ঈর্ষা করি, ওকে কিন্তু আমি শ্রদ্ধা করতাম।

যখনই বাড়ীতে গেছি, তখনই দেখেছি রঙ-তুলি-পেন্সিল নিয়ে শুভ বসে গেছে। স্নান-খাওয়া পর্যন্ত ভুলে যেত এক-একদিন। মাঝে মাঝে বলেছি, দেখবি, এই ছবি-ছবি করেই তুই একদিন পাগল হবি।

কথা শুনে মৃদু হাসতো। বলতো, ওরে এসব সাধনার জিনিস। ফাঁকি দিলে চলবে না। ওর একাগ্রতা দেখে সত্যি অবাক হয়ে যেতাম। ওর মা বলতেন, কি যে পেয়েছে একছবি। নাওয়া-খাওয়া নেই ঠিক সময় মত। সংসারের কোন কাজ নেই। দিনরাত ছবি আর ছবি! বুঝতাম এর থেকে ঘরে দুটো পয়সা আসছে তাহলে এক কথা ছিল। কিন্তু কোথায় পয়সা? যা পায়, তা ওর তুলি-রঙ কিনতেই যায়। মাসীমাকে বলতাম, দেখবেন শুভ একদিন খুব নামকরা লোক হবে।

উনি স্নেহের সুরে বলতেন, ছাই হবে। এ ছেলেকে নিয়ে যে কি করবো আমি, ভগবান জানেন। বয়স হয়েছে এখন তো ওর এসব বোঝা উচিত। এসব পাগলামি কি আমাদের মতো ঘরে পোষায়? নিজের জামাকাপড় নেই। টাকা দিলে সেই টাকা দিয়ে কি যে সব ছাই-পাশ কিনে আনে ওই জানে! কোন কিছুরই যেন খেয়াল নেই!

সত্যিই তাই!

রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে কতদিন সাইকেল রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে! ওকে সাবধান করে বলতাম, এইভাবে যে আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে যাস একদিন মরবি বলে দিলাম!

শুনে হাসতো শুভ। বলতো স্বপ্ন দেখতে দেখতে মৃত্যুরও একটা মূল্য আছেরে। আমার কি ইচ্ছে করে জানিস, সমস্ত পৃথিবীর এই চলার ছন্দকে আমি আমার রঙ-তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলি। সমস্ত জীবনটাই তো একটা ছবি!

কখনও হয়ত আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সামনে। বলেছে, দাঁড়িয়ে থাক। তুই আমার মডেল। শুধু আমি নয়। কত লোককে যে ও এইভাবে অনুরোধ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। পয়সাও দিত দুএকজনকে কারখানার কুলি, রিক্সাওয়ালা, পঙ্গু অথর্ব ভিক্ষুক থেকে আরম্ভ করে গ্রামের বউ, কলেজের মেয়ে আরও কতরকমের ছবি যে ও আঁকত তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

তারপর একসময় জীবিকার প্রয়োজনে চলে আসতে হোলো কলকাতায়। দুজনে কোনরকমে একটা ঘর ভাড়া নিলাম। বাপের টাকায় এন্তার সাহিত্যচর্চা করছি আর শুয়ে শুয়ে বুকে বালিশ দিয়ে গদ্য কবিতা লিখছি!

একটা চাকরিও জুটিয়ে নিলাম কলকাতায়, কেরানি-গিরি।

শুভ কিন্তু ওর স্বপ্ন নিয়েই মশগুল। আর্ট কলেজে ভর্তি হোলো। খুঁজে খুঁজে বার করত নতুন নতুন সাব্‌জেক্‌ট। ছবির বাইরেও যে আরো একটি জীবন আছে ও' যেন ভুলেই থাকত সেকথা। বেশ কয়েকমাস ওর খরচার টাকা বাকি পড়ল।

প্রথম-প্রথম কিছু বলিনি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে পারলাম না। একদিন বলেই ফেললাম, এভাবে তো আর থাকা চলে না। তুমি বসে বসে রঙ-তুলি নিয়ে স্বপ্ন দেখবে, আর আমি খেটে খেটে তোমাকে এনে খাওয়াব। না ভাই এতটা উদারতা আমার নেই। তুমি অন্যচেষ্টা কর। আশ্চর্য, শুভ আমার কথার কোন জবাব দিল না। শুধু অবাক হয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একসময় দেখলাম, ওর চোখ দুটো জলে ভরে গেছে। কিন্তু কান্না দেখে ভোলবার মত মন তখন আমার নয়। রেগে বললাম, অত ঢং বাপু ভালো লাগে না। মনে মনে ভাবলাম, ও ভেবেছে এই রকমের কান্না দেখিয়ে আমার মন গলাবে। একটু চোখের জল ফেলে মাসের খরচা যদি বাঁচানো যায় মন্দ কি! আমার রাগ হবার অবশ্য সংগত কারণও ছিল।

বলেছিলাম, চাকরি যখন পাস না, তখন দুটো টিউশানি কর। লেখাপড়া তো শিখেছিস। দুতিনজন ছাত্রও জোগাড় করে দিলাম। কিন্তু হপ্তাখানেক গিয়ে পড়ানো আর ভালো লাগল না ওর! হেসে বলেছিল, রাগ করিস না ভাই, ওসব ছাত্র পড়ানো আমার দ্বারা হবে না। শুধু হিসেব আর ফরমুলা! এতটুকু ভাবনার খোরাক নেই। যতক্ষণ পড়াবো, ততক্ষণ আমি একটা ছবি সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারবো।

তারপর কাছে এসে গায়ে হাত রেখে বলতো, তোর কথা আমি চিরদিন মনে রাখবো। হাসতে হাসতে বলতো, দেখিস আমার যেদিন জীবনী বেরুবে, সেদিন তোর নাম হবে সবচেয়ে আগে।

সত্যি কথা বলতে গেলে, ওর মধ্যে হয়ত এমন একটা গুণ আছে যার জন্যে রাগ করতে পারতাম না। কেমন যেন উদাস দৃষ্টি। বড় মায়া লাগে ওকে দেখলে! বড় মিষ্টি স্বভাবের ছেলে! কারও ওপর রেগে কথা বলতে ওকে দেখিনি কোনদিন!

মোটামুটি বছর দুয়েক আমিই চালালাম।

শুভর বাড়ী থেকে প্রায়ই চিঠি আসতো। ওর বাবা লিখতেন, সংসার চলে না। তিনটে বড় বড় মেয়ে ঘাড়ের ওপরে। এদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি আর কদিন বাঁচবো। ছেলেমানুষ নও তুমি। এসব বোঝার বয়স তোমার হয়েছে। টাকার অভাবে তোমার মা শয্যাশায়ী! মঞ্জুকে ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দিয়েছে। অপমৃত্যুই বোধহয় আমার কপালে লেখা আছে...।

প্রথম কয়েকদিন চিঠি পেয়ে মনটা ওর খুব খারাপ লাগত। অসহায় কণ্ঠে বলতো, কে আমাকে চাকরি দেবে বল? কি জানি আমি কাজের! সামান্য দশ-পাঁচ-টাকার হিসেব রাখতে গিয়ে আমার সাতবার ভুল হয়। সত্যি কথা বলতে, ওসব ফাইল ঘাটা, হিসেব-নিকেস

পরদিন অফিস থেকে এসে দেখি, আমার টেবিলের উপর সুন্দর একখানা ছবি, ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাতরাচ্ছে এক শিল্পী পথের ধারে। তবু ম্লান চোখে তুলি ধরে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

ও আমার ভালো লাগে না। তার আগে আমি যেন মরে যাই। বিরক্ত হয়েই বলেছিলাম, এটাও খুব গুণের কথা নয়। একদিন তো তোকে সংসার করতেই হবে। আজ না হয় বাপ-মা আছে! আর সংসার ভালো না লাগে লোটা-কম্বল নিয়ে হিমালয়ে চলে যা, সংসারেও থাকব অথচ সংসার দেখব না, এটা আত্মপ্রবঞ্চনা। এর ফল সুখের নয়।

ওর দেশ থেকে আসা গ্রামের লোকের মুখে প্রায়ই শুনতাম, ওদের সংসারের অত্যন্ত দুর্দশা! বাবা অসুখে শয্যাশায়ী। ছোটভাই মা-বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। দেনায় দেনায় ওর বাবা একেবারে তলিয়ে গেছে। মা'র গায়ের সব গয়না স্যাকরার দোকানে গিয়ে উঠেছে!

কিছুদিন বাদে ওর মা আমাকে একটা চিঠি লিখলেন। যাতে আমি বুঝিয়ে ওকে সংসারী করি। বাড়ী-ঘরের দিকে যেন ওর মন আসে।

কিন্তু সংসার কি কাউকে বুঝিয়ে করানো যায়? বিশেষ করে ওর মত ছেলেকে! তবু বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাকে কি বোঝাবো? ওকে তখন 'ছবির' প্রেমে পেয়ে বসেছে।

একদিন রাগ কোরে ওর চাল নিলাম না। বললাম, না ভাই আমাকে বাধ্য হয়েই কঠিন হতে হচ্ছে। এ আর চলতে দেওয়া উচিত নয়। তোমার বিবেক না থাকতে পারে কিন্তু আমার ও বস্তুটি এখনো মরে যায়নি। আমিই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছি। আমার এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে যা ইচ্ছা তাই করো। আমি কিছু বোলব না। কিন্তু তোমার এ আমিরি চালকে আর উৎসাহ দিতে পারি না।

পরদিন আফিস থেকে এসে দেখি, আমার টেবিলের ওপর সুন্দর একখানা ছবি, ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাতরাচ্ছে এক শিল্পী পথের ধারে। তবু ম্লানচোখে তুলি ধরে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

বড় সুন্দর হয়েছে ছবিটা। বিভিন্ন জায়গা থেকে খুব প্রশংসা পেল। কলা-সমালোচকরা চিঠি লিখলেন তারিফ কোরে!

কিন্তু শুধু প্রশংসায় কি আর পেট ভরে?

তবু এর মধ্যে নিজে কষ্ট করেও ওকে নিয়ে চলছিলাম। মনে মনে ওর প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধা যেন বেড়েই যাচ্ছিল। খবরের কাগজে ওর নাম আর প্রশংসা দেখে গর্ব হোতো মনে। ভাবতাম, ওর সাফল্যের মূলে আমারও যেন অংশ রয়েছে।

হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটল।

বাড়ী থেকে টেলিগ্রাম এল ওর বাবা মৃত্যুশয্যায়। ওকে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু সেই যে ও কলকাতা ছাড়লো আর ফিরে এল না। একমাস যায়, দু'মাস যায় কোন খবর নেই। শেষে ওদের বাড়ীর ঠিকানায় একটা টেলিগ্রাম করলাম। এবার চিঠি এল।

অবশ্য শুভ লেখেনি। লিখেছে ওর ছোট বোন। ওদের বাবা আর বেঁচে নেই। দাদা তো অনেকদিন কলকাতা চলে গেছে। দাদার খবর সত্বর জানাবেন।

অবাক হলাম চিঠিটা পেয়ে। তাহলে শুভ কোথায় গেল?

পরিচিত সব জায়গাতেই খোঁজ নিলাম। না, ও কোন জায়গাতেই আসেনি। তাহলে? এরকম ভাবনার মধ্যে দিন কাটছিল। নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হতে লাগল।

এবার আর একটা চিঠি পেলাম। শুভর লেখা। ঠিকানা বিহীন।

ছোট্ট কয়েকটা কথা।

আমার কথা ভাবিসনে। তোর ঋণ জীবনেও শোধ করতে পারবো না। সংসারের সব খবর শুনেছিস নিশ্চয়ই! শুধু এইটুকুই বুঝেছি, আমার মত অপদার্থের এ পৃথিবীতে থাকা উচিত নয়...

চিঠিটা পেয়ে আরও দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। ওর পক্ষে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। যেমন সেন্টিমেন্টাল! ও' সব করতে পারে!

সর্বত্র আবার নতুন করে খোঁজ আরম্ভ করলাম। পুলিশে খবর দিলাম। ওর একটা ফটোও দিলাম সনাক্তকরণের সুবিধের জন্য। খবরের কাগজেও বিজ্ঞাপন দিলাম।

আশ্চর্য, কোন জায়গা থেকেও ওর এতটুকু সংবাদ পেলাম না।

পরে ওদের গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে সব শুনলাম। বিনা চিকিৎসায় ওর বাবা মারা গেছেন। শুভ নিজের চোখের সম্মুখে সেই মৃত্যুকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। মরার সময় ওর মা বলেছিল, দ্যাখো, শুভ এসেছে তোমাকে দেখতে। তাকাও!

চোখ বন্ধ রেখে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উনি নাকি বলেছিলেন, শুভ মরে গেছে। ও নামে আমার কোন ছেলে নেই। ও' যদি সত্যি আমার ছেলে হোতো, তাহলে কি আমি এভাবে মরতাম? চাপা কান্নায় ওর বাবা নাকি বলেছিল, মরার সময় ও' যেন না থাকে আমার সামনে। আমার মুখাগ্নি করতে দিও না ওকে।...

মৃত্যুর কয়েকদিন পর শুভ যেন কেমন হয়ে গেল। চুপ-চাপ বসে থাকতো। কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলতো না। কেবল শুয়ে শুয়ে কাঁদতো।

গ্রামের লোকরা বলতো, ছি ছি ছি। এমন ছেলে যেন শত্রুরও না হয়। এতবড় জোয়ান ছেলে থাকতে বাপ-ভাই-বোন না খেয়ে মরে! খবরের কাগজের নাম দিয়ে কি ধুয়ে খাবি হতচ্ছাড়া?

সবার অপমান সহ্য করে শুভ চলে এল। বাড়ীতে বলে এসেছিল, কলকাতা যাচ্ছি। ওর মা সব শুনে কদিন খুব কান্নাকাটি করলে। কান্না ছাড়া আর কি-ই বা আছে?

সত্যি-সত্যি শুভ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

প্রথম-প্রথম বিভিন্ন মাসিক পত্রিকা, আর্ট একজিবিসন থেকে লোক আসতো আমার কাছে শুভর ছবির জন্য। সবাই প্রশ্ন করতো ওর সম্পর্কে। কিন্তু আমিই বা কি করে বলি ওর কথা! সব জায়গায় জানিয়ে দিলাম আর্টিস্ট শুভময় ঘোষ আর এখানে থাকে না। বন্ধু-বান্ধবদের বলেছি, শুভ মরে গেছে। বলেছি, দেশে গিয়ে কি একটা অসুখ হয়েছিল, তাতেই মারা গেছে।

তারপর জীবিকার প্রয়োজনে চলে এলাম বাংলার বাইরে। নানা জায়গায় ঘুরলাম। অনেকের কথাই তখন ভুলেছি। জীবনের প্রয়োজন তখন বেড়েছে। শুভর কথাও ভুলে গিয়েছিলাম। বুঝেছি, এ পৃথিবীতে কাউকে মনে রাখাটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। বছর কয়েক পরে ওর ছোট বোনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মেডিকেল কলেজে নার্সের কাজ করে। যাদবপুরের ওদিকে থাকে। শুভর খোঁজ ওরাও পায়নি।

ওরাও ভেবেছে আর্টিস্ট শুভময় ঘোষ মরে গেছে।

তারপর আজ কতদিন পরে!...

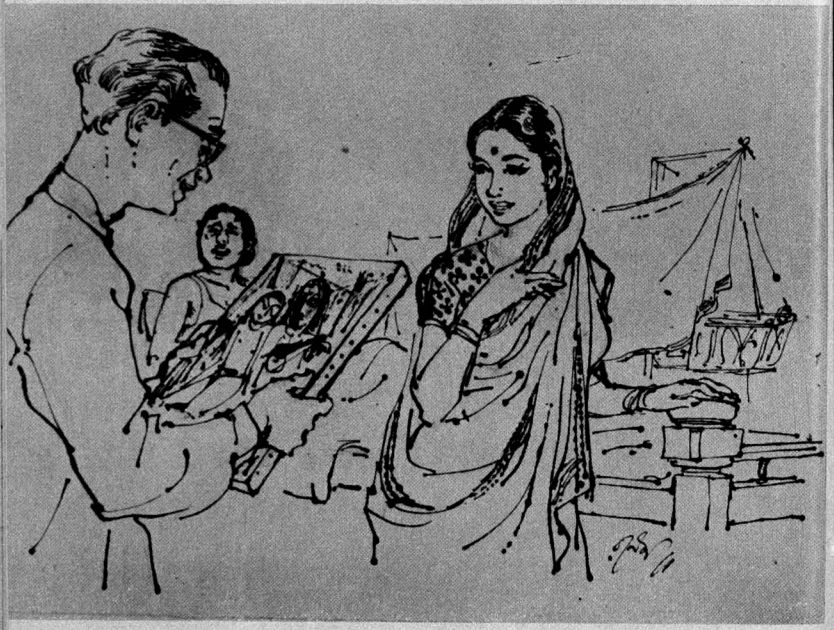

ছবিটা হাতে নিয়ে বললাম, বাঃ সুন্দর ছবিটাতো! তোর তাহলে ছবির নেশা এখনও যায়নি।

যাবার সময় অনুরোধ করলো—ওর বাসায় একদিন যেতে। মা, ছোট ভাই-বোন সবাই আজকাল ওর কাছেই থাকে। বললো, তোকে দেখলে মা খুব খুশী হবেন।

তাছাড়া তোর একটা নেমন্তন্নও পাওনা আছে।

হেসে বললাম, ও কাজ হয়ে গেছে বুঝি? একটু হাসলো শুভ। আবার বললাম, তুই যে বলেছিলি মন জানাজানি করে বিয়ে করবি। আর্ট কলেজের সেই শকুন্তলা বোস, তার কথাও বুঝি ভুলেছিস? একটু বুঝি অসতর্ক হয়েছিল ও। ধাক্কা লেগে হাতের গোলাপ জলের শিশিটা মেঝেয় পড়ে গেল। ভেঙে গেল শিশিটা।

—ইস্ আট আনা দামের শিশিটা ভেঙে গেল রে! তারপর সেই ভেঙে যাওয়া গোলাপ জলের শিশিটার দিকে তাকিয়েই বললো, নারে, শকুন্তলা-টকুন্তলা নয়। এ একেবারে পাকা গৃহিণী! মেয়েটি কিন্তু ভাই খুব সংসারী। কি করে কম টাকায় সংসার চালাতে হয় জানে। আমার মনের মত হয়েছে। সারা মাসে দুসের তেল দিয়ে সংসার চালায়। পাই-পয়সাটির হিসেব রেখে দেয়।

ওর দিকে অবাক হয়ে একবার তাকালাম। মাথা নিচু করে পয়সা গুনছে! রাস্তায় একটা বাস বিশ্রী শব্দে ছুটে চলে গেল।

সেদিন খুব করে অনুরোধ করেছিল ওর বাসায় যাবার জন্য।

ঠিকানা নিয়ে হাজির হলাম একদিন। করলবাগ। অনেক বাঙ্গালী এখানে থাকেন। কাজ সেরে যেতে যেতে একটু রাত হয়ে গেল। কিন্তু দরজার সামনে দাঁড়াতেই থমকে গেলাম।

হ্যাঁ। শুভরই গলা। বিশ্রীভাবে চীৎকার করছে। ইতর, অভদ্র গালাগাল। তার দুএকটুকরো আমার কানে এসে পৌঁছুলো!

—এ কি তোমার বাবার কেনা জিনিস? রীতিমত পয়সা দিয়ে কিনে আনতে হয়েছে। রোজগার তো করতে হয় না। রোজগার করলে বুঝতে পারতে কত ধানে কত চাল!

অপরপক্ষও দমবার পাত্র নয়।

—বেশ করেছি। অত হিসেব আমি দিতে পারবো না। সবসময় টাকা-পয়সার হিসেব। কেন আমি কি চুরি করি, না অন্য কাউকে দেই?

—দাও কি না দাও সে তুমিই জানো। তোমাদের দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই!

—তাইতো, নিজে যেমন স্বভাব-চরিত্তির খুইয়ে বসে আছেন। সবাইকে তাই ভাবেন, অভদ্র!

সুরুতেই মনটা কেমন বিষিয়ে গেল। ভাবলাম, যাবো না।

কিন্তু না গিয়েও পারলাম না। মাসীমাকে কতদিন দেখিনি। তাছাড়া শুভর সংসারটাও দেখার ইচ্ছা ছিল! দরজায় কড়া নাড়লাম। শুভই এগিয়ে এল, পরনে একটা লুঙ্গি। কৈফিয়তের সুরে বললাম, একটু রাত হয়ে গেল!

শুভকে দেখলাম, দুতিনজন ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বসেছে। পাশে পড়ে রয়েছে একটা বেত। ছেলেমেয়েগুলোর কেমন যেন ভয়-ভয় ভাব।

শুভই বললো, প্রাইভেট টিউটর শুধু ফাঁকি দেবার তালে থাকে। শুধু টাকার শ্রাদ্ধ! মাসীমা এলেন। প্রণাম করলাম। শুনলাম, ভাইবোনেরা সব আজকাল এখানেই থাকে। শুভই ওদের লেখাপড়া শেখায়। ছোট ভাই

ডাক্তারি পাশ করেছে। ছোট বোন মুক্তো আজকাল এম. এ. পড়ছে!

মাসীমা বললেন, আর আমার দুঃখ নেই বাবা। শুভটা মানুষ হয়েছে! এখন আর আমার সংসারে কোন অভাব নেই!

পরে ওর বৌর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ভদ্রমহিলা বেশ সুন্দরী! চোখ দুটো তো খুবই সুন্দর! চেহারাটার মধ্যেও একটা রুচির ছাপ আছে!

ঘরের মধ্যে দেখলাম একটা ছবি পড়ে আছে, খাটের এককোণে। ছবিটা হাতে নিয়ে বললাম, বাঃ সুন্দর ছবিটাতো! তোর তাহলে ছবির নেশা এখনও যায়নি! ভালোই, এর চর্চা ছেড়ে দিস্‌নে। অন্তত কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হতে দোষ কি। তোর ছবির হাত দেখি এখনও বেশ ভালই আছে। এত ঝড় জলেও তোর তুলির রঙ মুছে যায়নি তাহলে?

শুভ কিন্তু আমাকে অবাক করে দিল।

বললো, নারে ওটা আমার নয়। আমার হাত দিয়ে আর এসব জিনিস বেরুবে না। দোলনায় শোওয়ানো বাচ্চা ছেলেটা কেমন করে যেন কেঁদে উঠলো!

চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। শুভই বললো ছেলেটা অমন করে স্বপ্নের ঘোরে কেঁদে ওঠে। হ্যাঁ।

চলতে চলতে এক জায়গায় দেখলাম, ফুটপাতে একটা ছবির একজিবিশান। শুভই বললো, এই সেই পাঞ্জাবী ছেলেটি।

যা বলছিলাম, ছবিটা আমার এক পাঞ্জাবী বন্ধুর! অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ভালোমত খেতে পায় না, তবু ওই এক ছবির রোগ। নিজেই আঁকে। নিজেই বিক্রী করে। তা আমাদের এই মহারাণী কিনে এনেছেন ছবিটা পাঁচটাকা দিয়ে। কি আছে এই ছবির মধ্যে? যার জন্যে পাঁচটাকা দেওয়া যায়! আর এ ছবি দিয়ে আমি কি করবো? ঘরে টাঙিয়ে রাখলে, দুদিন বাদে ময়লা পড়বে। অতো সাবিআনা আমাদের ঘরে পোষায় না।

ওর স্ত্রীর পক্ষে বললাম, না ভাই, যাই বলো, ওনার পছন্দ আছে। সত্যি ছবিখানা ভালো হয়েছে। পাঁচটাকা আর এমনকি ছবিটার দাম! আর তাছাড়া দ্যাখ, তুই না বুঝলে কে বুঝবে বল? এতো শুধু ছবিকে ভালবাসা নয়, এর পেছনে যে আরো কিছু লুকিয়ে আছে। তুইও তো এককালে ছবিই আঁতি! স্ত্রী ছাড়া স্বামীর মনের ব্যথা কে বুঝবে বল?

চুপ করে রইল শুভ। কথাটার কোন জবাব দিল না। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে!

বললাম, এত কাছে এসেছি, চল একদিন সবাই মিলে তাজমহল দেখে আসি।

—না রে ভাই ওসব দেখবার সময়ও নেই। মনও নেই। হাতের কাছের বেতটা নিয়ে ছোট ছেলেটাকে একবার মারলো। রেগে বললো, হারামজাদা অনেকক্ষণ ধরে দেখছি, হাঁ করে গল্প শুনছে!

একধরনের অসন্তোষ আর বিরক্তি আমার মনের মধ্যে

ক্রিয়া করছিল। মামুলি শিষ্টাচারের কয়েকটা কথা বলে চলে এসেছিলাম সেদিন!

যেখানে উঠেছিলাম, যাবার দিনে শুভ সেখানে এল, আমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে।

একটু খোঁচা দিয়েই বললাম, তোর দোকানের কোনো ক্ষতি হলো নাতো?

শুভ বুঝি একটু দুঃখ পেল। চুপ করে রইল।

জিনিস সামানাই ছিল। একটা টাঙ্গা করে বেরিয়ে পড়লাম, কর্মব্যস্ত দিল্লীকে পিছনে ফেলে যাচ্ছি। ঘোড়াটাকে অনবরত চাবুক মারছিল সহিস!

বিকেলের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমের আকাশে। বড্ড রক্তাক্ত মনে হচ্ছে। শুভ তাকিয়েছিল সেইদিকে। অনেকদিন বাদে ওর বেদনাদীর্ণ স্বপ্নমদির চোখটাকে দেখলাম। কেমন যেন ব্যথায় ম্লান! একসময় আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, তুই আমার খোঁজ না পেয়ে ভেবেছিলি, আমি মরে গেছি, তাই না?

চুপ করে রইলাম, এ কদিন দিল্লীতে থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তাতে কি করে ভাবি—ও' আজো বেঁচে আছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, শুভ তাকিয়ে আছে টাঙ্গাওয়ালার চাবুকের দিকে। যেটা মাঝে মাঝে ঘোড়াটার ওপর পড়ছে!

চলতে চলতে একজায়গায় দেখলাম, ফুটপাথে একটা ছবির একজিবিশন। শুভই বললো, এই সেই পাঞ্জাবী ছেলেটি। একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। ঘড়ি দেখলাম। ট্রেনের এখনো বেশ দেরী আছে। নেমে পড়লাম টাঙ্গা থেকে দুজনে।

ছবি সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই পরিমিত। তবু যতটুকু বুঝলাম, তাতে মনে হল, ছেলেটির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। সুন্দর ভদ্র ব্যবহার। সহজ, সরল, অমায়িক। কয়েকজন দরদাম করছিলেন। কিন্তু কেউ কিনছেন না।

একজন বাঙ্গালী তনয়া অনেকক্ষণ ধরেই একটা ছবি দেখছিলেন। সঙ্গে আর একজন যুবক। কিন্তু দরে বনছিল না। মেয়েটির চোখে-মুখে বিরক্তির ছায়া। সঙ্গের ভদ্রলোক বললেন, দেখুন, এরা না খেয়ে মরবে, তবু জেদ ছাড়বে না। ছবি আজকাল কজন কেনে? তিরিশ টাকা দিয়ে ছবি কিনবে কে? এদের না খেতে পেয়ে মরাই ভাল। অভাবের জ্বালায় ছবি আঁকা দুদিনে ডকে-উঠবে। যতসব—। একটা অশিষ্ট ইংগিত করলেন ভদ্রলোক।

আশ্চর্য, পাঞ্জাবী ছেলেটি কিন্তু কোন প্রতিবাদ করল না। মৃদু হাসলো। এযেন তার গা সওয়া হয়ে গেছে!

কিন্তু যাকে দেখে সবচেয়ে বেশী অবাক হলাম। সে শুভ।

ভদ্রলোকের সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া লাগিয়ে দিল শুভ। বললো, একজন শিল্পীকে এভাবে অপমান করবার কোন অধিকার নেই। আরও কয়েকজন ওকে সমর্থন জানালেন। দুঃখে, ক্ষোভে, বেদনায় ও' যেন কাঁপছিল, ওকেই বুঝি কেউ অপমান করেছে মনে হল।

তারপর সেই ভদ্রলোকের চোখের সামনে তিরিশটাকা দিয়ে ছবিটা কিনলো।

ছবিটির নাম 'মৃত্যুহীন দেবতা'।

অবাক আমিও কম হলাম না। তিরিশটাকা দিয়ে ছবি কেনাকে আমিও একধরনের বিলাসিতা বলে মনে করি। তাছাড়া একদিনে শুভর যে পরিচয় পেয়েছি তাতে তিরিশটা টাকা ও খরচা করলো কি করে তাই ভাবছিলাম।

বললাম, তুই তাহলে শিল্পীর মর্যাদাটা রাখতে পারলি? এ সম্মান তোর নিজের। তবু একটু ব্যঙ্গ করেই বললাম, তিরিশটাকা দিয়ে তোর তিরিশ দিনের বাজার হতোরে!

শুভ কেমন যেন হাসলো! বুঝতে পারলাম না সেটা হাসি না কান্না!

টাঙ্গাওয়ালার চাবুক বুঝি আর একবার ঘোড়াটার পিঠের ওপর পড়ল, অসহায় করুণ চোখদুটো মেলে জন্তুটা এগিয়ে চললো।...

শব্দহীন
নিস্তব্ধ দু-পহর—
আকাশে অসীম ব্যাপ্তি
নিঃসিম নিলের।
তারি মাঝে একটি চিলের
বিষণ্ণ চিৎকার—
জাগায় ধিক্কার,
বেতারের
সেতারের
সকল আমোদ।

চিলের চিৎকারে জাগে
তিলোক কামোদ।

দুপুরের রাগিণী

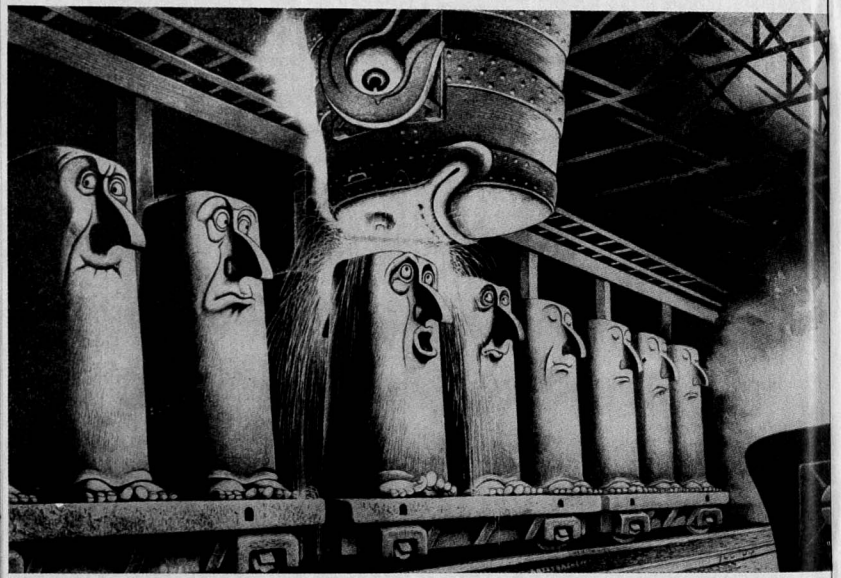

শিল্পী আর্জি বাশেফ গলিত ধাতুর
আধারগুলিকে মানবীয় গুণে বিশিষ্ট কোরে
তুলেছেন এতে। শিল্পী আর্জি-
বাশেফ অধুনা আমেরিকার অধিবাসী।

ইস্পাতের আলপনা

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

তরুণ কবি ও প্রবন্ধকার।
অধ্যাপক। প্রাচীন
ভারতের মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ে
গবেষণায় ব্যাপৃত।
বাংলা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ-সংকলন
'হালকা মেঘের মেলা'
সম্পাদনা করেছেন।
স্বরচিত কবিতা-সংকলন
'সোনাটা' অচিরে প্রকাশিত হবে।

চোখে-দেখা এ বিশ্বের সর্বত্র সকলের চোখ যায় না। কারো কারো যায়।

'প্রত্যহের আনাচে কানাচে' কত ছবি কত রঙ ছড়িয়ে থাকে, তাদের কতটুকু ক'জনের নজরেই বা পড়ে! প্রতিটি দিনকে নতুনভাবে দেখার চোখ ক'জনেরই বা আছে?

আছে। যাঁদের আছে সংখ্যায় তাঁরা পরিমিত। কবি শিল্পী সাহিত্যিকের সমবায়ে গঠিত সেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দৃষ্টি প্রত্যুতই বিচিত্রপথগামী ও সর্বত্র-সঞ্চারী। দুর্লভ সেই দৃষ্টির আলোয় সামান্যের মধ্যে অসামান্য, তুচ্ছের মধ্যে অমূল্য, যন্ত্রের মধ্যে প্রাণময়তা উদ্ভাসিত হোয়ে ওঠে। তাই চোখের দেখা নয়, দেখার চোখই আসল।

দেখার চোখ সর্বত্রসঞ্চারী তো হবেই, কিন্তু সেই সঙ্গে গূঢ়গভীর হওয়া তার অবশ্যপ্রয়োজন। দৃষ্টি যত গভীর হবে, অনেক আপাত-সামান্য ও আপাত-তুচ্ছও তত মূল্যবান অর্থময়তায় বিশিষ্ট হোয়ে উঠবে, শিল্পসৃষ্টি ও জীবন তত ঘনিষ্ঠ ঐক্যে সমন্বিত হবে। আর তখনই শিল্পসৃষ্টি সার্থক।

সার্থক শিল্পী তিনি-ই, যাঁর শিল্পকর্মে সমসাময়িক কাল লোকোত্তর ও কালোত্তর বাণীর মাধুর্যে ব্যঞ্জিত। অর্থাৎ যিনি তাঁর কালকে জীবন্তভাবে তাঁর সৃষ্টিতে তুলে ধরেন এবং তাকে ভবিষ্যতের সঙ্গে ব্যঞ্জনায় অন্বিত করেন। আমাদের শ্রুতিতাই বিশ-শতকী সার্থক শিল্পীর কর্মে গজদন্তমিনার-বাসীর বন্ধ্যা বন্ধ্যা কল্পনার অলস জৃম্ভণের পরিবর্তে যন্ত্রশাসিত বিশ্বের হৃৎস্পন্দন দাবি করে।

অর্থাৎ আমরা শিল্পলুব্ধের দল—আজকের শিল্পী-দের কাছে আশা করবো দৈনন্দিনের প্রতিচ্ছবি, দৈনন্দিনকে অবলম্বন কোরেও যা চিরন্তনতার মূল্যে বিশিষ্ট। যে মানুষ হাজার হাজার কারখানায় জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের সাধনায় মগ্ন, চাঁদে বসতি স্থাপনের স্বপ্নে বিভোর, তার কাছে পাঁচ শো বছর আগেকার কথা শুনতে চাই না। তার কাছে চাই সে যা ভাবছে সে যা করছে তারই নির্ভরযোগ্য শিল্পবিবৃতি।

আজকের কবি তাই যখন কল-কারখানাকে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু করেন কিংবা আজকের চিত্রক যখন কলকারখানাকে তাঁর চিত্রে মূর্ত কোরে তোলেন, তখন

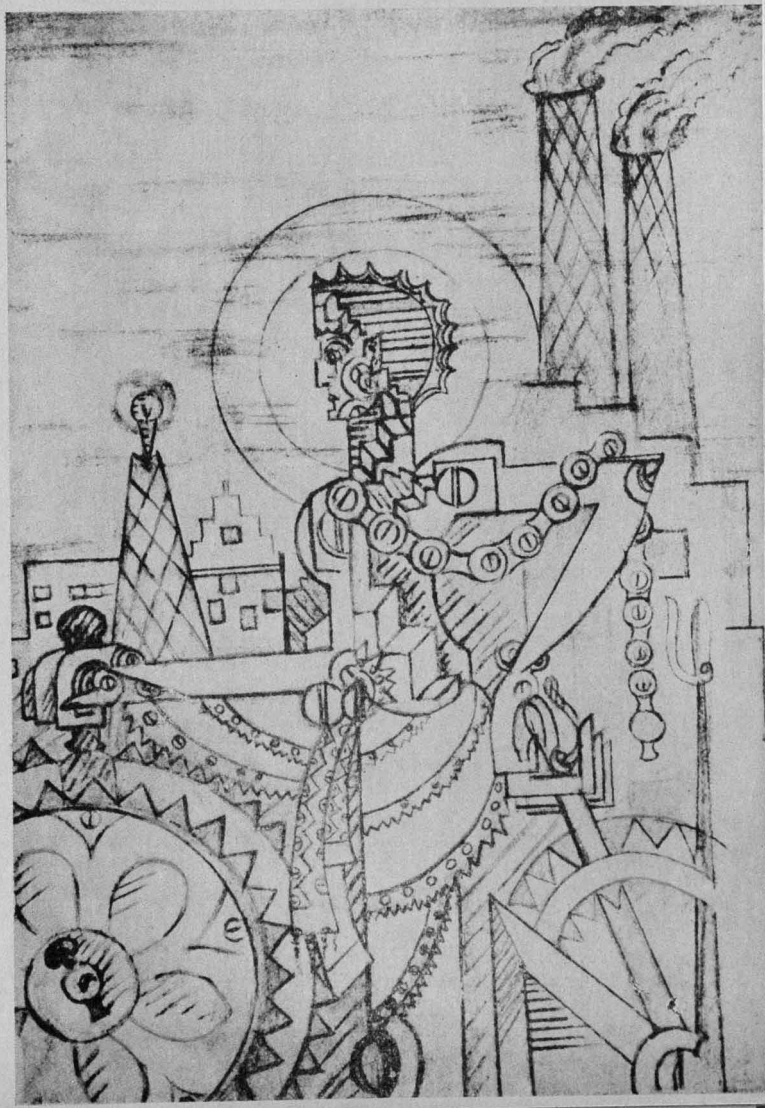

গুলি লোহার যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে একটি মিশরীয় পিরামিডের ভিতর থেকে।

অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোকরা যে লোহার ব্যবহার জানতো তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। নিকট-ও-মধ্য-প্রাচ্যের প্রায় সব জায়গাতেই খৃীস্টের জন্মের দেড় হাজার দু হাজার বছর আগে থেকেই লোহার চল ঘটেছিল। প্রাচীন পৃথিবীর বাসিন্দাদের মধ্যে এশিয়া মাইনরের হিটাইট জাতি না কি লৌহ-শিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলো। পণ্ডিতদের মতে, প্রধানত হিটাইটদের মাধ্যমেই এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে লোহার ব্যবহার প্রচলিত হয়। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত লোহার নিদর্শনসমূহের সবগুলি আকরিক লোহার তৈরি কি না সন্দেহ, বরং উল্কাপিণ্ডজাত লোহায় তাদের অনেক-গুলি তৈরি বোলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

স্যামুয়েল স্মাইল্স্ ভারতবর্ষকে লোহার আবিষ্কারকের সম্মান দিলেও এ সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। শ্রীযুত রাজশেখর বসুও 'ভারতের আর্যপূর্ব কোন জাতি'কে লোহার আবিষ্কারক বোলে মনে করেন। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা 'সিন্ধু সভ্যতা'র ব্যাপক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লৌহের কোনো নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নি। 'সিন্ধু সভ্যতা'র পরবর্তী বৈদিক সভ্যতার রূপকারগণ সম্ভবত লোহার ব্যবহার জানতেন; সম্ভবত বলার কারণ, ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'অয়স্'- শব্দের অর্থ নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতদ্বৈধ রয়েছে, 'অয়স্' কারো কারো মতে তামা, কারো কারো মতে লোহা বোঝাতে ব্যবহৃত হোয়েছে। তবে উত্তর-ভারতের অধিবাসীদের আগে দক্ষিণ-ভারতের লোকরা লোহার ব্যবহার শিখেছিল; এবং দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন স্থানে সুপ্রাচীন এমন কি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক লোহার হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হোয়েছে।

ঋগ্বেদোত্তর প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে লোহার উল্লেখ আছে। অশ্মসার, কান্তলোহ, কালায়স, তীক্ষ্ণলোহ প্রভৃতি শব্দাবলী তার প্রমাণ। শুধু ঋগ্বেদ বা তৎসমসাময়িক সাহিত্যেই নয়, যজুঃ ও অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদিতেও লোহার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, কৃষ্ণ যজুর্বেদে 'সূর্মী' নামে এক ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। টীকাকার সায়ন এই শব্দটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে এটি ছিল জ্বলন্ত লোহার নল বা ব্যারেল (জ্বলন্তী লৌহময়ী স্থূণা সূর্মী)। এই আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে এক সঙ্গে এক শত শত্রু নিধন করা যেত। অথর্ববেদে যে 'শ্যামময়'-এর উল্লেখ আছে সায়নের মতে তা কৃষ্ণ ধাতু বা লোহা।

রামায়ণ ও মহাভারতে লোহার প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভীম ও দুর্যোধনের লোহার গদার কথা কে না জানেন? কে না জানেন সীমাহীন ক্রোধের জ্বালায় ধৃতরাষ্ট্র তাঁর শত পুত্রের হন্তারক ভীমের লৌহমূর্তি বিচূর্ণ করেছিলেন?

মনুসংহিতায় দৈনন্দিন ব্যবহার্য বাসনপত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়; এই সব বাসনপত্র তামা, ব্রোঞ্জ, পিতল টিন, লোহা ইত্যাদি বিবিধ ধাতুতে তৈরি হতো। মনু আরো বলে গেছেন, মূল্যবান পাথর এবং তামা, রূপা লোহা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতুর অপহরণকারীকে শাস্তি-স্বরূপ বারো দিন শুধুমাত্র কণান্ন খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে।

স্বনামধন্য আয়ুর্বেদজ্ঞ সুশ্রুত (আনুমানিক খৃীস্ট-পূর্ব অথবা খৃীস্টীয় প্রথম শতক)-বিরচিত সংহিতায় প্রায় এক শ রকমের ভৈষজ যন্ত্রপাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে মনে হয় এই সব যন্ত্রপাতির অনেকগুলি হয়তো সেরা জাতের ইস্পাত থেকে তৈরি হোতো। এইভাবে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে লোহার বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু অশ্মসার ও তীক্ষ্ণলোহ পর্যায়ের লোহাকে যথাক্রমে ঢালা লোহা ও ইস্পাত বোলে অনুমান কোরেছেন। অপর দুটি পর্যায়ের লোহা সম্পর্কে তিনি কোন অনুমান কোরতে পারেন নি। সে যাই হোক এক সময় বিদেশে ভারতীয় লোহার যে বেশ চাহিদা ছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার নজির বিদ্যমান। যেমন, এদেশের wootz* নামীয় ইস্পাত

---

*এই শব্দটি সম্পর্কে স্বর্গত পঞ্চানন নিয়োগী যা বলেছেন, তা হলোঃ

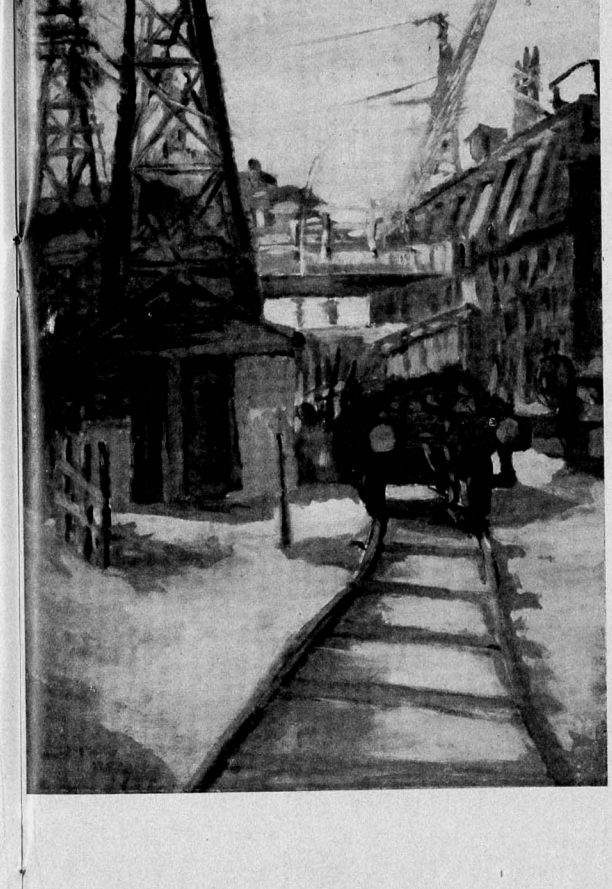

The word "Wootz", by which name Indian steel

ছবির নাম 'স্লিপার ইয়ার্ড'। শিল্পী—অমৃত মাথুর। 'স্টুডিও'র সভ্য হিসেবে এই চিত্রটি কোলকাতায় প্রশংসার সঙ্গে প্রদর্শিত হয় ইং ১৯৫৭ সালে।

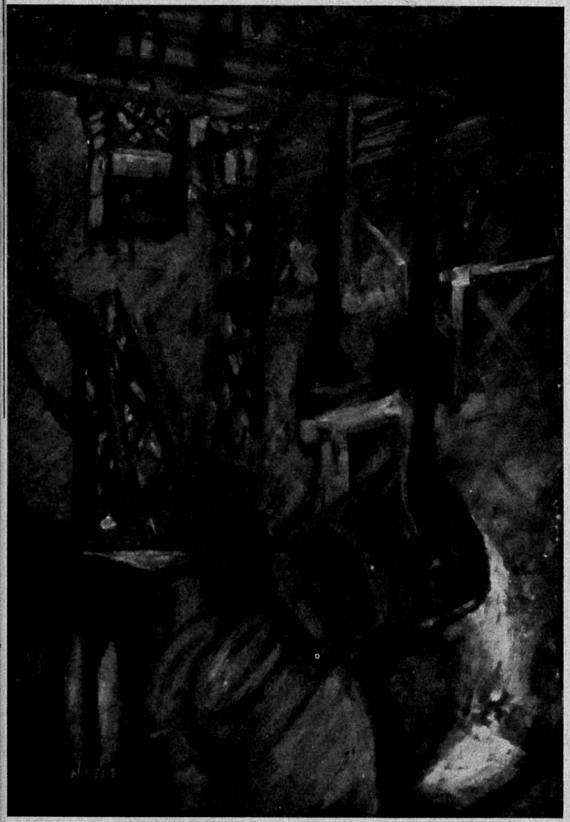

ছবির নাম 'ফ্ল্যাগ ওভার ফ্লো'।
শিল্পী—সন্তোষকুমারী রোহাতগী।
মহিলা শিল্পীদের মধ্যে ইনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন কোরেছেন।
ইনিও স্টুডিও'র একজন সভ্যা।

থেকেই না কি দামাস্কাস ও টলেডোর প্রসিদ্ধ তলোয়ার তৈরি হতো। শেফিল্ডের কারখানাগুলিও দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতীয় লোহা আমদানি করতো। বস্তুত প্রাচীন কালেই ভারতবাসীরা যে ইস্পাতশিল্পে দক্ষতা অর্জন কোরেছিল, কুইন্টাস কার্টিয়াসের রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কার্টিয়াস ভারতীয় রাজ পুরু কর্তৃক আলেকজান্ডারকে দশ পাউন্ড ওজনের ইস্পাত উপহার দানের উল্লেখ কোরেছেন। হাঁথ সাহেব কার্টিয়াসের এই উল্লেখের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কোরেছেন। তাঁর মতে, আলেকজান্ডারের সময় প্রতীচ্য জগতে যদি ইস্পাতের খুব চল থাকতো, তবে ত্রিশ পাউন্ড ওজনের ইস্পাত বিশ্ববিজয়ীকে উপহার দেবার উপযোগী বিবেচিত হতো না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ধাতুবিদ্যায় পারঙ্গম না হোলে আকরিক লোহাকে ইস্পাতে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়, সুতরাং কার্টিয়াসের উপর্যুক্ত উল্লেখ ধাতুবিদ্যায় প্রাচীন ভারতীয়দের নৈপুণ্যেরই পরিচয় বহন করে। লোহাশিল্প তথা ধাতুবিদ্যা যে প্রাচীন ভারতের অন্যতম অনুশীলনের বিষয়বস্তু ছিল, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে উল্লিখিত 'আকরাধ্যক্ষ' (খনির অধিকর্তা), 'লোহাধ্যক্ষ' (লৌহাদি ধাতু-নির্মাণ দপ্তরের অধিকর্তা) প্রভৃতি শব্দাবলী তার প্রমাণ। ঔষধ হিসাবেও লোহা প্রাচীন ভারতীয়গণ কর্তৃক ব্যবহৃত হতো।

প্রাচীন ভারতের দৈনন্দিন জীবনে ও শিল্পকর্মে লোহা যে কতখানি সক্রিয় অংশ গ্রহণ কোরেছিল এবং ভারতবাসীরা লৌহশিল্পে, অন্যভাবে ধাতুবিদ্যায়, যে কি অসামান্য পারদর্শিতা অর্জন কোরেছিল, সাহিত্যগত উল্লেখ ছাড়া তার বহু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও পাওয়া গেছে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণাবলীর সর্বাগ্র সারিতে আছে দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ মেহরৌলি লৌহস্তম্ভ†। দেড় হাজার বছরের পুরানো এই লৌহস্তম্ভের উপর আজও কোনরকম মরিচা পড়ে নি। প্রাচীন ভারতীয়দের এই আশ্চর্য ধাতুবিদ্যাপারঙ্গমতার নির্ভুল প্রমাণ ছাড়া আরো একটি বিস্ময় হলো স্তম্ভটির বিরাটত্ব। সেকালে কি কৌশলে প্রায় ৬ টন ওজনের এত বড় লোহার জিনিসটি গড়া হোয়েছিল তা ভাবলে সত্যই অবাক হোতে হয়। বিশ্বের বিমুগ্ধ বিস্ময় দিল্লীর লৌহস্তম্ভের পরে যার উল্লেখ করা যায়, তা হলো

was and is still known in Europe, is a curious word meaning steel made in Southern India. The name seems to have originated in some clerical error or misreading very possibly for "Wook" representing the Canarese word "ukku" meaning steel.

জে. এম. হাঁথ মনে করেন সেকালে বোম্বাই অঞ্চলে প্রচলিত গুজরাটী ভাষায় ইস্পাতকে Wootz বলা হতো। স্বর্গত পঞ্চানন নিয়োগী হাঁথ সাহেবের এই মত গ্রহণ করেন নি। এ জাতীয় লোহার উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেন: Wootz seems to have been prepared from time immemorial in the Nizam's Dominions, Mysore and Salem, and other parts of the Madras Presidency and was the metal from which the famous Damascus blades were prepared. (Iron in Ancient India: Panchanan Neogi, p. 65).

† দিল্লীর লৌহস্তম্ভ সম্পর্কে জনৈক ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ারের মত প্রণিধানযোগ্য: Nothing heretofore brought to light in the history of metallurgy seems more striking to the reason as well as the imagination, than this fact that from the remote time when Hargist was ruling Kent and Cedric landing to plunder our barbarous ancestors in Sussex down to that of our Third Henry, while all Europe was in the worst darkness and confusion of the Middle Ages—when the largest and best forging producible in Christendom was an axe or a sword blade—these ancient peoples in India possessed a great iron manufacture, whose products Europe even half a century ago could not have equalled. (পঞ্চানন নিয়োগীর Iron in Ancient India গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃষ্ঠা ২০)

মান্ডুর লৌহস্তম্ভ। ভগ্নদশাপ্রাপ্ত মান্ডুর স্তম্ভটি আকারে দিল্লীর স্তম্ভটির প্রায় দ্বিগুণ এবং এটিও প্রাচীন ভারতের ধাতুশিল্পীদের আকর্ষণীয় কীর্তি-রূপে বিবেচিত। এ ছাড়া বুদ্ধগয়ার মন্দিরের কোনও কোনও জায়গায়, কিংবা ভুবনেশ্বর, পুরীর বা কোনারকের মন্দিরের ছাদ ইত্যাদির অবলম্বনরূপে লোহার বীমের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারী কাজ ছাড়া ছোটখাট কাজেও যে লোহার ব্যবহার হতো খ্রীস্টীয় পনেরো ষোলো শতকের কয়েকটি লৌহলেখ তার প্রমাণ এবং এ-জাতীয় শক্ত কোন জিনিসের উপর এমন কি তাল বা ভূর্জ-পাতার পুঁথির উপর লেখার জন্যও লোহার তৈরী কীলক ব্যবহৃত হতো। আর দৈনন্দিন জীবনের জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ইত্যাদিতে লোহার বহুল ব্যবহারের কথা তো বলাই বাহুল্য।

লৌহশিল্পে, অন্যভাবে ধাতুশিল্পে, ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রমাণ ইতিহাস আর মহাকাল। সপ্তদশ শতকের প্রসিদ্ধ ফরাসী পর্যটক ট্যাভারনিয়ের তাঁর বিবরণীতে ভারতীয় ইস্পাতশিল্পের অকুণ্ঠ প্রশংসা কোরেছেন।

তিন

ট্যাভারনিয়ের যদি কিছুদিন পরে আসতেন, তা হোলে কি সেই প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ কোরতে পারতেন? না, কারণ ভারতীয় লৌহশিল্পের গৌরব-সূর্য তখন অস্তাচলের সীমানায়। কিন্তু আজ এই বিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে যদি আবার তিনি আসেন তা হোলে? তা হোলে তিনি হয়তো তাঁর সময়কার ভারতকে আর চিনতে পারবেন না। অবাক হোয়ে দেখবেন ভারতের আকাশ রঞ্জিত হোয়ে উঠেছে লৌহ-

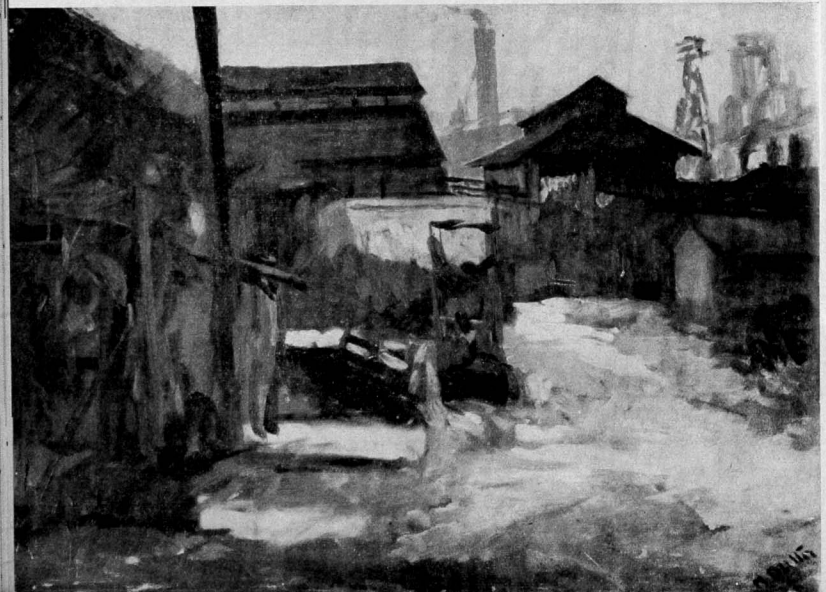

শিল্পী মিনতু দত্ত অঙ্কিত
ইস্পাত শহরের একটি নির্জন কোণ।

শিল্পী দিলীপকুমার দাশগুপ্ত অঙ্কিত 'প্যাটার্ণ ইন্ গ্রে'। ধ্‌সর যন্ত্রসভ্যতার একটি অপরূপ চিত্র।

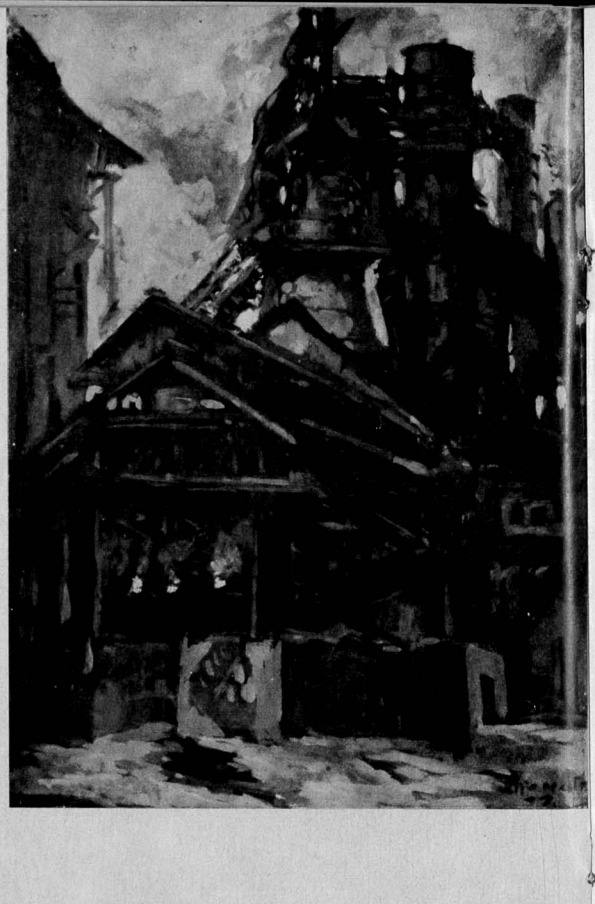

শিল্পী নীপা মৈত্র।
ছবির নাম 'কাস্ট্ হাউস'।

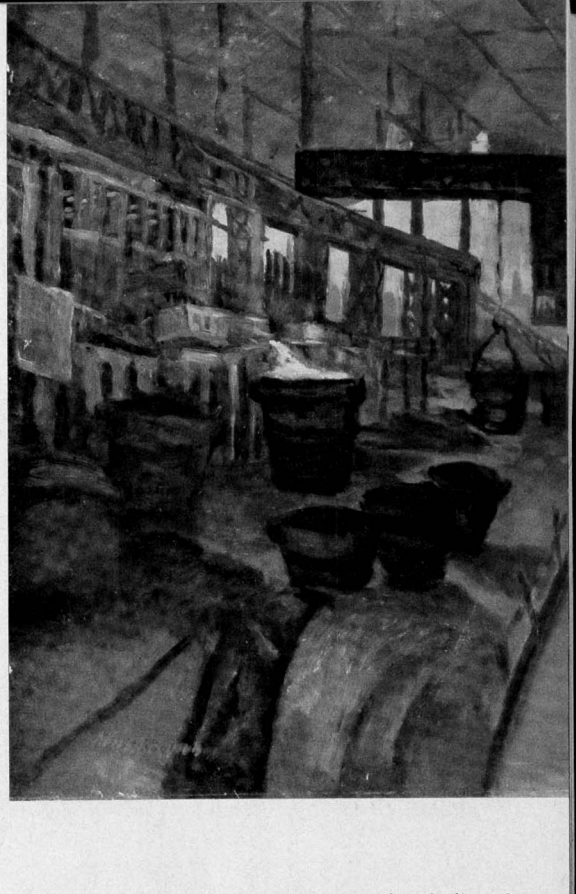

শিল্পী—মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী
অঙ্কিত 'ট্যাপিং দি স্টীল'।

চুল্লীর অনল-শিখায়, কামারশালার ঠকাঠক হাতুড়ির শব্দ আর ইস্পাতের নিঃশ্বাস ছাপিয়ে উঠছে লক্ষ যন্ত্রের সদর্প গর্জন আর চিমনির দুরন্ত ধোঁয়ার মায়া-কুণ্ডলী। অবাক বিস্ময়ে নতুন ভারতকে নিয়ে তিনি নতুনতর বিবরণী রচনা করবেন আর অধিকতর প্রশংসা-মুগ্ধ ভাষায় হয়তো বোলবেন ধাতুশিল্পে ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

কবি-কল্পনা নয়, সত্যই ভারত আজ লৌহশিল্পে পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হোয়েছে, লৌহ-শিল্পে সত্যই সে জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিতে চোলেছে। বিশ্বাস না হয়, টিস্কো-ইস্কো-ইস্কনদের চুল্লী-চিমনির মুখেই সে কথা কান পেতে শুনুন।

টিস্কো-ইস্কো-ইস্কন। পূর্ণত, টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি, ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি এবং ইন্ডিয়ান স্টীল কর্পোরেশন। জামসেদ-পুর, বার্নপুর ও দুর্গাপুরে অবস্থিত তিনটি অগ্রণী লৌহশিল্প-প্রতিষ্ঠান। মধ্যপ্রদেশে ভিলাই ও উড়িষ্যার রৌরকেলাতেও গড়ে উঠেছে দুটি লৌহরাজ্য। দুর্গা-পুর, ভিলাই ও রৌরকেলার নব-প্রতিষ্ঠিত লৌহ-প্রতিষ্ঠানগুলি এই বছরেই নতুন লোহা উৎপাদন

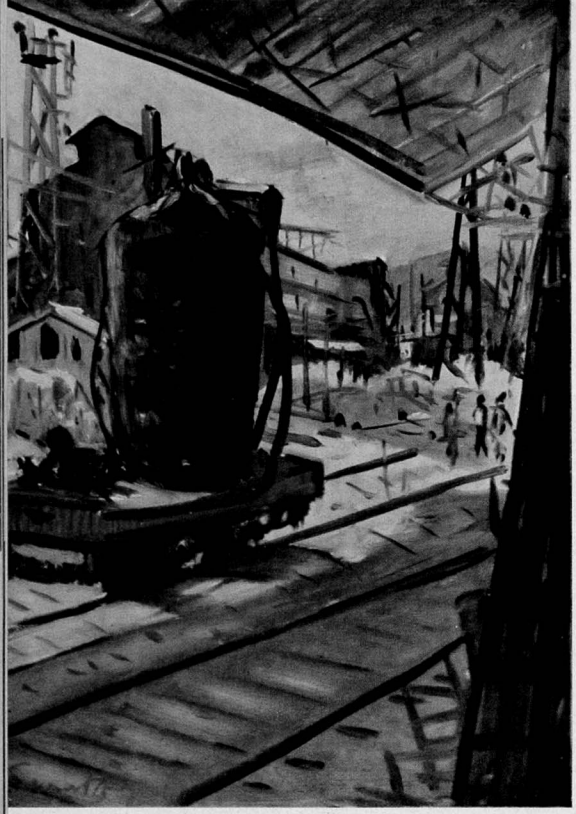

শিল্পী সনৎ কর অঙ্কিত 'মনস্টার লোড্'। লোহার কারখানার একটি বৈচিত্র্যময় অংশের বিচিত্র ছবি। ইনি বিখ্যাত 'স্টুডিও'র অন্যতম সভ্য।

শিল্পী শ্রীমতী করুণা সাহা—স্বনামধন্য আধুনিক মহিলা শিল্পীদের অন্যতমা, তাঁর 'গ্যালভানাইজিং দি সিট্স্' চিত্রটি লৌহকারখানার একটি দৃশ্য।

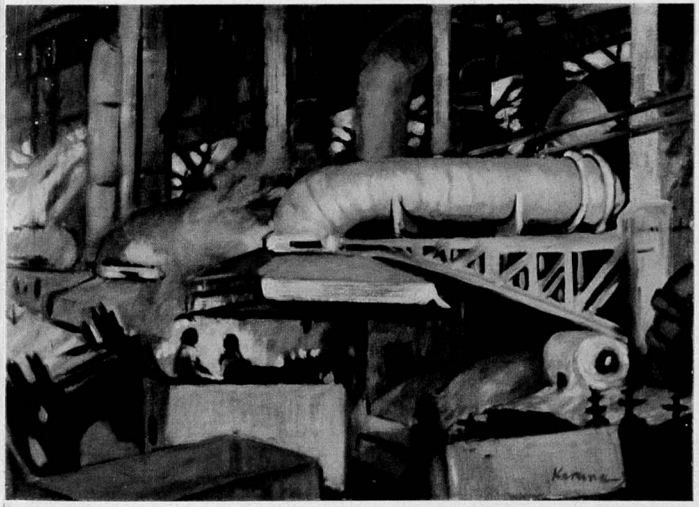

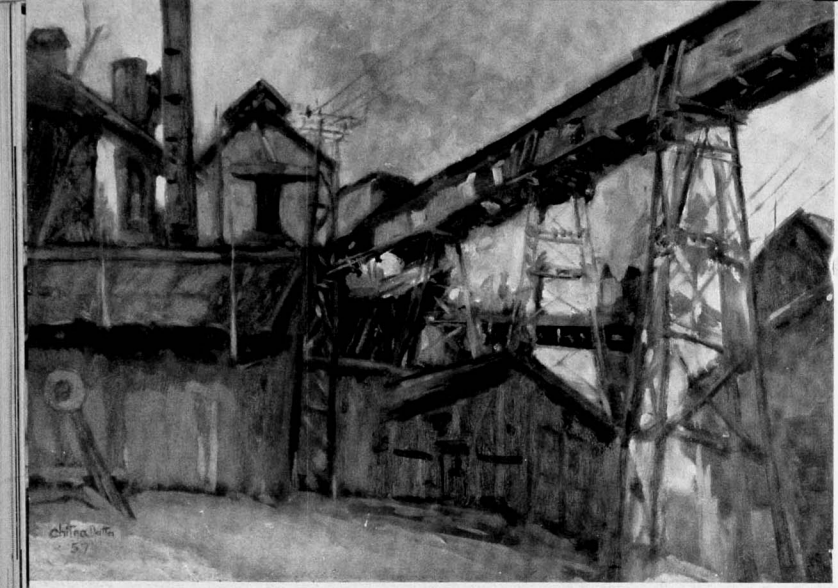

শিল্পী চিত্রা দত্ত
অঙ্কিত 'ক্যারিং দি কোক'।

কোরেছে। সমস্ত মিলিয়ে দেখতে গেলে, লৌহশিল্পী ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সন্দেহাতীতভাবেই স্বর্ণোজ্জ্বল।

আগামীকালের লৌহশিল্পের সেই স্বর্ণোজ্জ্বল প্রহরগুলিতে গর্বিত ভারতবাসীর মনে দূরদর্শী নক্ষত্রের মতো যে-দুটি নাম অম্লান জ্যোতিতে জ্বলতে থাকবে, তা হোলো প্রমথনাথ বসু ও জামসেদজী টাটা, ভারতীয় লৌহশিল্পের যাঁরা প্রথম অগ্রদূত। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ছোটনাগপুরের এক অরণ্য অঞ্চলে জামসেদজী টাটা ইস্পাতের কারখানা স্থাপন কোরেছিলেন। আর তাই তাঁর নামানুসারে অধুনা জায়গাটি টাটানগর নামেই পরিচিত। ভারতের তথা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম ইস্পাতশিল্প-প্রতিষ্ঠান-গুলির অন্যতম টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানির জন্মভূমি সেদিনের সেই আরণ্যভূমি। ভারতের অন্য আকাশে আজ যে রক্ত রঙের আভাস দেখা যাচ্ছে, জামসেদপুরের আকাশই তার স্মরণীয় উৎস-স্থল।

জামসেদপুর, বার্নপুর, দুর্গাপুর, ভিলাই আর রৌরকেলার লৌহ আর ইস্পাত কারখানাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলে যন্ত্রের রাজকীয় মহিমায় অবাক হোয়ে যেতে হয়। যন্ত্রের এই রাজকীয় মহিমায় যাঁরা শুধুই দম্ভের প্রকাশ দেখেন, আমি তাঁদের দলে নই। পরন্তু, ঐ সব কারখানার চুল্লী, চিমনি আর হরেকরকম যন্ত্রের মধ্যে যন্ত্র-শাসিত বিংশ শতাব্দী যে কত জীবন্তভাবে শিল্পায়িত হোয়েছে, তা দেখতে হোলে শিল্পীর চোখ থাকা চাই।

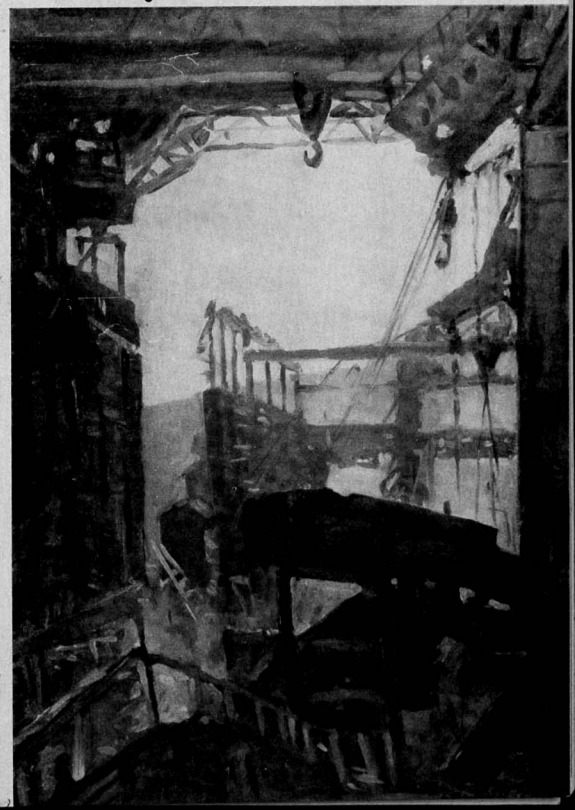

শিল্পী সুদর্শন এস. বেনেগাল
অঙ্কিত 'নির্মীয়মান ইস্পাত নগরী'।

এই পাতার উপরের ফটো চিত্রটি মার্কিণ মহিলা শিল্পী মিলড্রেড জনস্টন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিখ্যাত লৌহ-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের সহধর্ম্মিণী।

চার

এ নিবন্ধের গোড়াতেই বোলেছি, আজকের শিল্পী দৈনন্দিনকে অবলম্বন কোরে, তাঁর চারপাশের জগৎকে উপজীব্য কোরে শিল্পসৃষ্টি করেন। গজদন্তমিনার পরিহার কোরে, বলা যায় তাকে ধ্বংস কোরে, তাঁরা কঠিন-কঠোর বাস্তব ও বস্তুবিশ্বের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। সুতরাং কলকারখানা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি গদাময় জিনিসের মধ্যেও তাঁরা সুর আর ছন্দ, ফর্ম আর প্যাটার্ন খুঁজে পাচ্ছেন এবং স্বীয় অনুভূতির রঙে-রসে রঞ্জিত কোরে তাদের শিল্পভোক্তার সামনে মোহনীয় মাধুর্যে উপস্থিত কোরছেন।

এ জাতীয় আধুনিক চিত্রকরদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন কোরেছেন বোরিস আর্জিবাশেফ। মার্কিনবাসী এই রুশ চিত্রশিল্পীবরের ইস্পাতী যন্ত্রপাতির মধ্যে মানবীর প্রাণাবেগ সঞ্চারের ক্ষমতা এক কথায় অপূর্ব। এবং এ ব্যাপারে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর কেউ স্বীকার করুন না করুন, প্রখ্যাত মার্কিন সংবাদ-সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকার নিয়মিত পাঠকরা অন্তত আর্জিবাশেফের অভিনব ও দুর্লভ চিত্রশিল্পীপ্রতিভার পরিচয় বহুবার পেয়েছেন বোলে অকুণ্ঠচিত্তে সে-কথা মানবেন।

শ্রীমতী জনস্টন কৃত ইস্পাতের নক্‌সা সম্বলিত একটি নক্‌সী-কাঁথা।

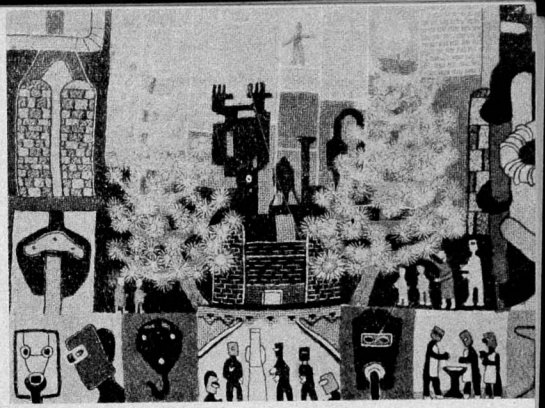

শ্রীমতী জনস্টন-এর করা একটি কাঁথার নক্‌সা।

আর্জিবাশেফ মুখ্যত যন্ত্রশিল্পী; যন্ত্রনির্মাতা শিল্পী নন, যন্ত্র-রূপায়ক শিল্পী। নিষ্প্রাণ ইস্পাতী যন্ত্রসমূহ তিনি মানুষের মতো সপ্রাণ কোরে তুলেছেন, রেখা-রঙের মাধ্যমে তাদের বাঙ্ময় কোরে তুলেছেন, তাঁর চিত্রধৃত যন্ত্রাবলী মানুষের মতো অনুভূতি-সম্পন্ন; যে বিরাট গলিত-ধাতুর আধার আপাতচোখে কঠিন লোহার আধারমাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, আর্জিবাশেফ-এর চোখে তা প্রাণবান, তপ্ত লৌহ-নিঃস্রাব সেই আধারের মধ্যে পড়বার আগে যে তারও আশঙ্কাতুর মুখে ভয়ের ও যন্ত্রণার করুণ চিহ্ন ফুটে ওঠে, আর্জিবাশেফ-এর চোখ দিয়ে আমরা তা প্রথম দেখলাম। মনে হলো, সত্য, জড় পদার্থকে এমনভাবে তো ইতিপূর্বে কোনদিন দেখি নি। কিংবা কারখানার মানুষী মজুরদের মতো যন্ত্রগুলিও যে স্বয়ং মজুরের মতো উদয়াস্ত খেটে চলেছে, তাও তো ইতিপূর্বে দেখি নি। কঠিন লোহা দীর্ঘকাল ঘুমে ছিল অচেতন, লক্ষ মানুষের মিলিত হাতের ছোঁয়ায় সে জেগেছে আর আর্জিবাশেফ-এর মতো কয়েকজনের দুশ্চর সাধনায় সে আজ লীলাচঞ্চল। কঠিন লোহার যন্ত্রপাতিও যে মানুষের মতো হাসে, কাঁদে, গান করে সেদিকে আমাদের

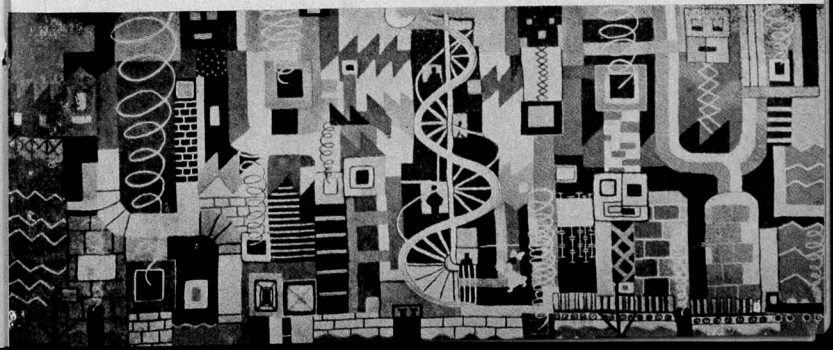

নীরদ মজুমদারের অননুকরণীয় ভঙ্গীতে একটি গলিত ইস্পাতের ছবি। এই ছবিটিতে তাঁর প্যারিস প্রত্যাবর্তনের পরের ভঙ্গী বিশেষভাবে প্রকটিত।

শিল্পী জ্যোতিষ ভট্টাচার্যের বিমূর্তধারায় অঙ্কিত 'ইস্পাতের অগ্নিশ্রী'—তাঁর অঙ্কনের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছেন বোলে আর্জিবাশেফ মহৎ শিল্পীর আসন পাবেন।

তবে আর্জিবাশেফ-এর চিত্রধারার সমধর্মী না হোলেও অনুরূপ চিত্রকলার নিদর্শন আমরা পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তেও পেয়েছি। আর্জিবাশেফ-এর আগে আমাদের বাংলাদেশেরই শিল্পী যন্ত্রকে উপজীব্য কোরে ছবি এঁকেছিলেন। যন্ত্রপাতির বিভিন্ন অংশের বিচিত্র সমাহারের মধ্যে বাঙালী শিল্পী আবিষ্কার কোরেছিলেন একালের অধীশ্বর 'কল্কি'-অবতারকে। যন্ত্রশাসিত শতাব্দীর মর্মবাণী তাঁর সেই ছবিতে যে-আশ্চর্য গভীরতায় মূর্ত হোয়েছিল, তা আধুনিক বাংলা চিত্রকলা-রাজ্যে বিরলদৃষ্ট ও স্মরণীয় সৃষ্টিরূপে অভিনন্দনযোগ্য।

আরো কয়েকজন বাঙালী শিল্পীর কথা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রমাণ—রথীন্দ্র মৈত্র, নীরদ মজুমদার এবং ও. সি. গাঙ্গুলী। যাঁরা শ্রীযুক্ত মৈত্রের নিজস্ব চিরাচরিত ভঙ্গীর ছবি দেখতে অভ্যস্ত তাঁরা প্রায় দশ-বারো বছর আগে আঁকা তাঁর 'ইস্পাতের আলপনা' ছবিটির মধ্যে একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম লক্ষ্য করবেন। নীরদ মজুমদারের ছবিতে তার স্বভাবী চিত্রণ পদ্ধতির এবং ও. সি'র ছবিতে একটি বিচিত্র ও সাহসী প্যাটার্নের পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক কালে

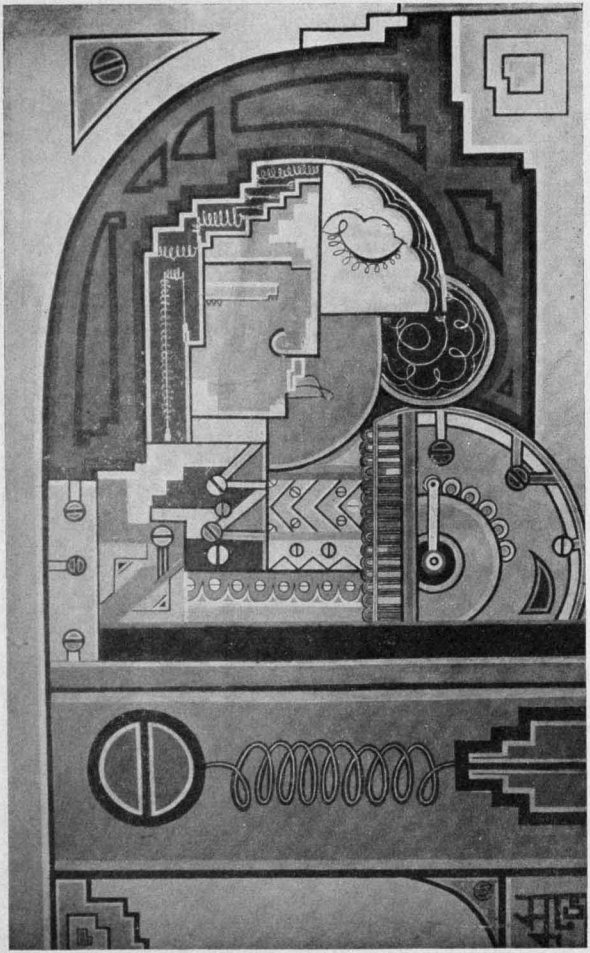

সুভো ঠাকুরের
মুরালের ভঙ্গীতে
আঁকা 'যন্ত্রের অন্তর'।

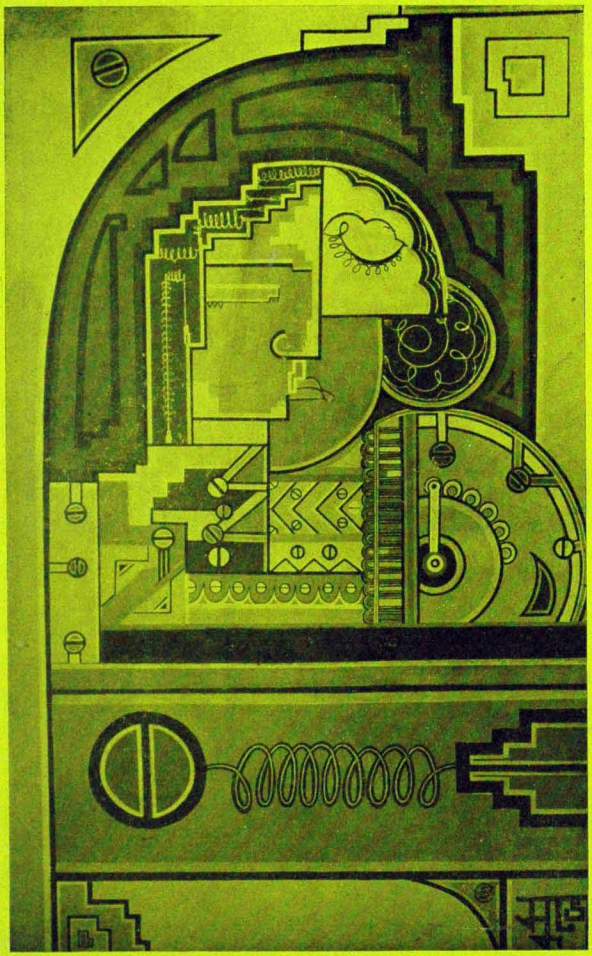

সুভো ঠাকুরের
মুরালের ভঙ্গীতে
আঁকা 'যন্ত্রের অন্তর'।

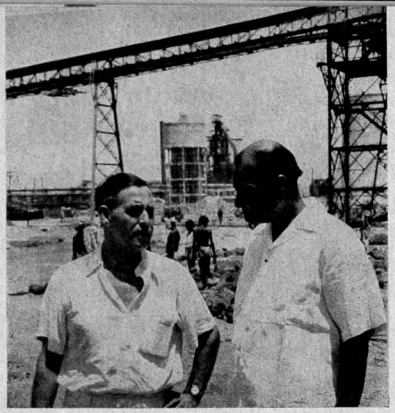

আধুনিক ভারতের ইস্পাত ইতিহাসের দুই ব্যক্তিত্বের আলাপন—ইস্কনের শ্রীযুক্ত বেল ও হিন্দুস্থান স্টীলের শ্রী করুণাকেতন সেন।

মূর্ত কোরে তুলতে আগ্রহী। সাম্প্রতিক ভারতীয় সূচীকর্মে অবশ্য তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি, কিন্তু মার্কিন মহিলা-শিল্পী শ্রীমতী মিলড্রেড জনস্টন তাঁর অনবদ্য সূচীকর্মে যে আশ্চর্য যুগচেতন মানসতার পরিচয় দিয়েছেন, তা যে কোন শিল্প-সন্ধিৎসুর মুগ্ধ বিস্ময় তোলার পক্ষে যথেষ্ট। যুক্ত-রাষ্ট্রের বেথলেহেম-এর অধিবাসিনী শ্রীমতী জনস্টন সূচীকর্মকে কারিগরির স্তর থেকে জাত শিল্পের কোঠায় তুলেছেন। মার্কিন দেশের আকাশ-ছোঁয়া ইস্পাত-কারখানার বিভিন্ন দৃশ্যাবলী তাঁর শিল্পদৃষ্টির রঙে অনুরঞ্জিত হোয়ে ফুটে উঠেছে বিবিধ সূচী-কর্মে। সমসাময়িক কালকে এভাবে ধরে রাখার যুগ-চেতন ও প্রগতিশীল চেষ্টা শ্রীমতী জনস্টনের সূচী-কর্মাবলীতে পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমতী জনস্টনের মতে, বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ও উদ্বেগ এবং তাদের নিরসন ও রূপান্তরণের নিত্য প্রয়াসে মুখর এই বিংশ শতাব্দীতে প্রত্যেক ব্যক্তি-মানসে একটা নতুন ধরনের বা নতুন জাতের নিঃসঙ্গতা জন্ম নিচ্ছে; এই নিঃসঙ্গতা দূর কোরতে হোলে গভীর ভাবে সচেতন হওয়া উচিত এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর সার্থক প্রকাশের জন্য সর্বদা সচেষ্টা করা দরকার। শিল্পকর্মে ইস্পাত-কারখানার ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইস্পাত-কারখানার পরিবেশে যারা জীবন যাপন করে, কারখানা বা কারখানার যন্ত্রপাতি তাদের শিল্পকর্মে একটি বড়ো ভূমিকা গ্রহণ কোরতে পারে। শ্রীমতী জনস্টনের বিশ্বাস, কারখানার কর্মী ও মজুরদের গৃহিণীরা যদি সূচ-সুতো নিয়ে কলকব্জা যন্ত্রপাতি ইত্যাদিকে তাদের কাজে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়, তবে তাদের কাজ এক নতুন মানবিক মূল্যবোধের দলিলরূপে সম্মান-স্বীকৃত হবে; কারখানায় প্রত্যেকটি মুহূর্তের রয়েছে অসামান্য মূল্য, একটি মুহূর্তের সামান্য এদিক-ওদিকের তফাতে রয়েছে ভয়াবহ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, সুতরাং তাদের স্বামীদের প্রত্যেকটি মুহূর্ত সম্পর্কে নিখুঁত সচেতনতা, তারই প্রমাণ পাওয়া যাবে তাদের সূচীকর্মে। অর্থাৎ ভারী শিল্প-শাসিত আধুনিক বিশ্বের নতুন জীবন-ছন্দ তাদের সূচীকর্মের প্রত্যেকটি ফোঁড়ে স্পন্দিত হোয়ে উঠবে। তা ছাড়া, তাদের স্বামীরা—কারখানার কর্মী ও মজুরের দলও—প্রতিদিনকার পরিচিত দৃশ্যগুলিকে শব্দ, রঙ আর আলোর সমন্বয়ে নতুনভাবে দেখতে

বিখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী ব্রায়ান ব্রেক-এর তোলা একটি আলোকচিত্র। ইস্পাত নগরীর এই দৃশ্য স্বতঃই 'রক্তকরবী'র সেই জালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না কি?

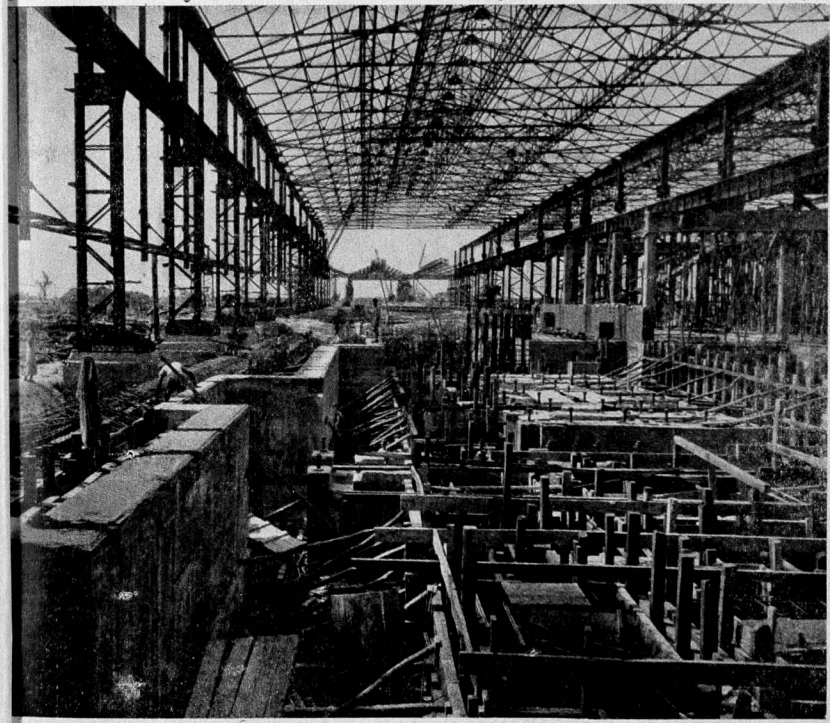

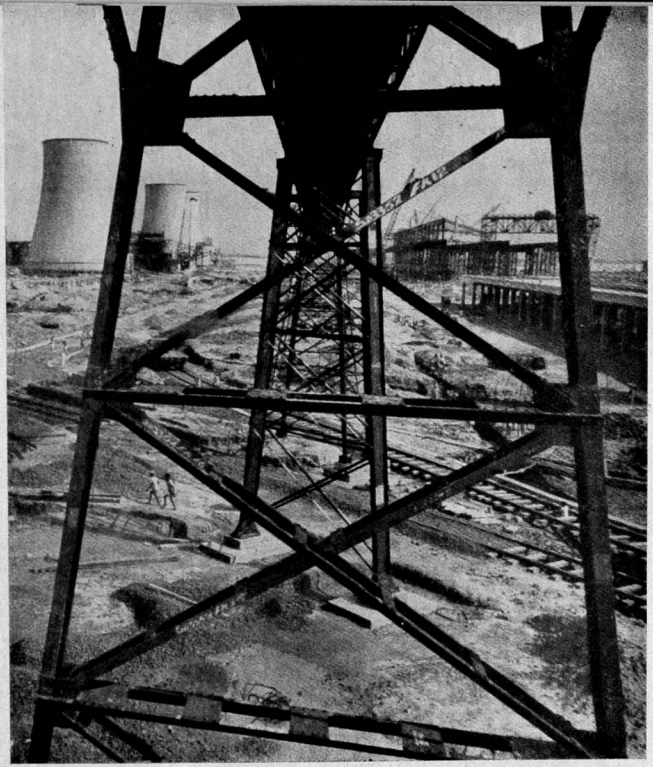

পারার আনন্দ লাভ কোরবে। এই ধরনের শিল্প-দৃষ্টির অধিকারিণী ও শিল্প-শাসিত আধুনিক জীবন-দর্শনে প্রগাঢ় বিশ্বাসী বোলেই শ্রীমতী জনস্টন নিজেও তাঁর সৃচীকর্মকে নিখুঁত কোরে তোলার অভিপ্রায়ে নিজে বেথলেহেমের স্টীল প্ল্যান্টে প্রায়শঃই যাওয়া-আসা করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারপর তিনি শুরু করেন তাঁর সৃচীকৃতি, তাঁর পুত্র নকশা অঙ্কনে সহায়তা করেন তাঁকে এবং কয়েক মাসের পরিশ্রমেই জন্ম নেয় এক-একটি মনোহরণ শিল্পকৃতি। তাতে কারখানার রিভেটগুলি ফুল আর গ্রহতারায় কিংবা মুখোশধারী ওয়েল্ডাররা মঙ্গলগ্রহ থেকে মানুষের মূর্তিতে, রূপান্তরিত হয়, ক্রেন, নাট-বল্টু,

ইস্পাতের আলপনা | সুন্দরম্। দুশো বাহাত্তর পৃষ্ঠা। তেরশো সাতষট্টি।

বাঁয়ের ছবিটি গাওয়ান্দের ইস্পাতনগরীর আলোকচিত্র। | তলার ছবিটি ব্রায়ানব্রেকের একটি আলোকচিত্র।

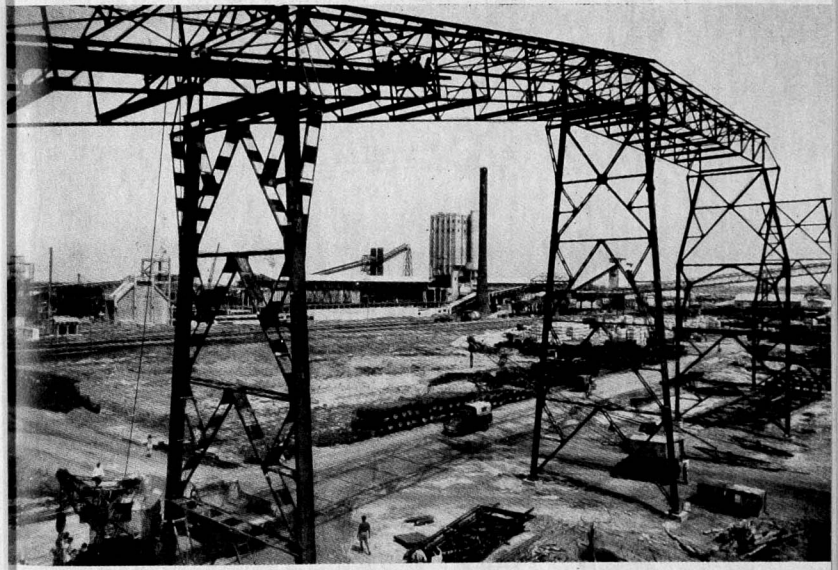

সুইচ-স্ট্যান্ড সমস্ত কিছুই এক-একটি মুগ্ধকর প্যাটার্নে জীবন্ত হোয়ে ওঠে।

শুধু চিত্রশিল্পী বা হস্তশিল্পী নন, ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার দৃষ্টিও যে যন্ত্রকে কী আশ্চর্য চমৎকারিত্বে উপস্থিত কোরতে পারে, তারও প্রমাণ আছে। প্রমাণ—গাওয়ান্দে ও ব্রায়ান ব্রেক। এঁরা উভয়েই ক্যামেরার চোখে ইস্পাতের ও ইস্পাত-শহরের প্রাণময় সত্তা আবিষ্কার করেছেন।

[এই নিবন্ধে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি তুলেছেন শ্রীরাম পুনজজী গাওয়ান্দে এবং ব্রায়ান ব্রেক।

লেখাপড়ায় কৃতী ছাত্র শ্রীযুক্ত গাওয়ান্দে ছোটবেলা থেকেই শিল্পানুরাগী। বারো বছর বয়সে তিনি জন্ম-

শ্রীযুক্ত গাওয়ান্দের তোলা এই ছবিটি ইস্পাতের অলঙ্করণের অপরূপ রূপ।

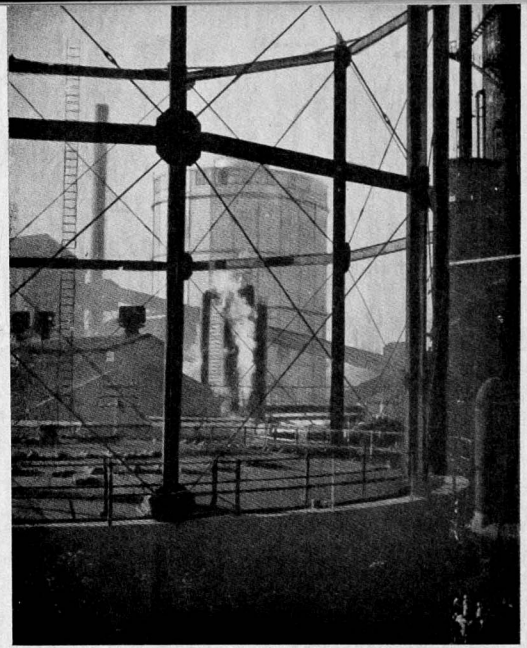

গাওয়ান্দের তোলা ইস্পাত নগরীর আর একটি আলোকচিত্র।

স্থান অকোলাতে তাঁর কাজের একটি প্রদর্শনী কোরেছিলেন। বরোদার কলাভবনে দু'বছর এবং বোম্বাইর 'জে. জে. স্কুল অব আর্টস'-এর চার বছর শিক্ষালাভান্তে তিনি উচ্চশিক্ষার্থে ইউরোপে যান। সেখানে লন্ডনের 'সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্‌'এ এক বছর শিক্ষালাভ করেন। ১৯৫১ সালে গাওয়ান্দে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানিতে যোগদান করেন। বছর সাত আগে শিল্পী গাওয়ান্দে ফটোগ্রাফিতে মনঃসংযোগ করেন এবং লেখাপড়া ও শিল্পকলার মতো ফটোগ্রাফিতেও সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ফটোগ্রাফিতে নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ 'আগফা' কোম্পানি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা থেকে তিনি বহুবার অজস্র পুরস্কার লাভ কোরেছেন।

রায়ান ব্রেকের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তিনি 'ম্যাগ্‌নাম্‌'-এর আলোকচিত্রশিল্পী। তিনি দুর্গাপুরে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে যে-সব ফটোগ্রাফ তুলেছেন এ প্রবন্ধে তার কয়েকটি প্রকাশ করা হোলো।]

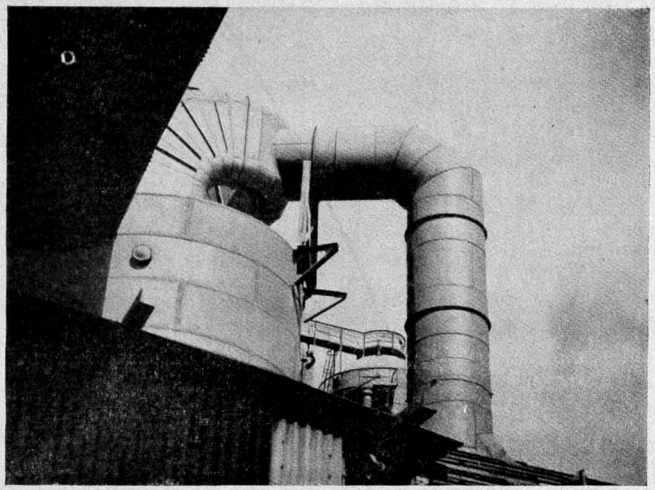

চলচ্চিত্র জগতের বিখ্যাত আর্ট ডাইরেক্টর বংশী চন্দ্র গুপ্তের তোলা লৌহযন্ত্রের অদ্ভুত অবয়ব।

পাঁচ

আসল কথা হোচ্ছে দেখার চোখ, অনুভূতিশীল হৃদয়। এ যুগল সম্পদ যাঁর আছে, তিনি জানেন, মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পাবার অধিকার যন্ত্রেরও আছে। দীপ্ত-অগ্নি শত-শতঘ্নী প্রকাণ্ড প্রচণ্ড যন্ত্র —অনেক অসম্ভব যাদের অনিঃশেষ কর্মনিষ্ঠায় সম্ভব হোয়েছে—আজ তারা নতুনভাবে ধরা পড়ছে শিল্প-লুব্ধের চোখে। একদিন যারা শুধুমাত্র যন্ত্র বোলেই উপেক্ষিত হতো, আজ তারা নিজস্ব মূল্যে প্রতিভাত হোচ্ছে। কারিগরির মাথায় আজ শিল্পের স্নেহার্দ্র আশীর্বাদ।

তাই জগৎ-জয়ে বহির্গত কঠিন লোহা আজ আর শুধু লোহা নেই, মানুষের জীবনের সঙ্গে সে আজ নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। লোহা তাই আজ আর নিছক স্থাবর বা জড় পদার্থ রূপে উপেক্ষিত হয় না, তারও সৌন্দর্য আবিষ্কার কোরেছে শিল্পীর দল। সে সৌন্দর্য কঠিন, কিন্তু যন্ত্রযুগের শিল্পী বলে, হোক সে সৌন্দর্য কঠিন, তবু তা আমার প্রিয়। আমি সেই কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।

কঠিন যন্ত্রকেও শ্রদ্ধেয় কোরে তোলেন যাঁরা, চির-শ্রদ্ধাযোগ্য সেই শিল্পীকুলের কাছে বিশ্বসংসারের কৃতজ্ঞতা অন্তহীন।

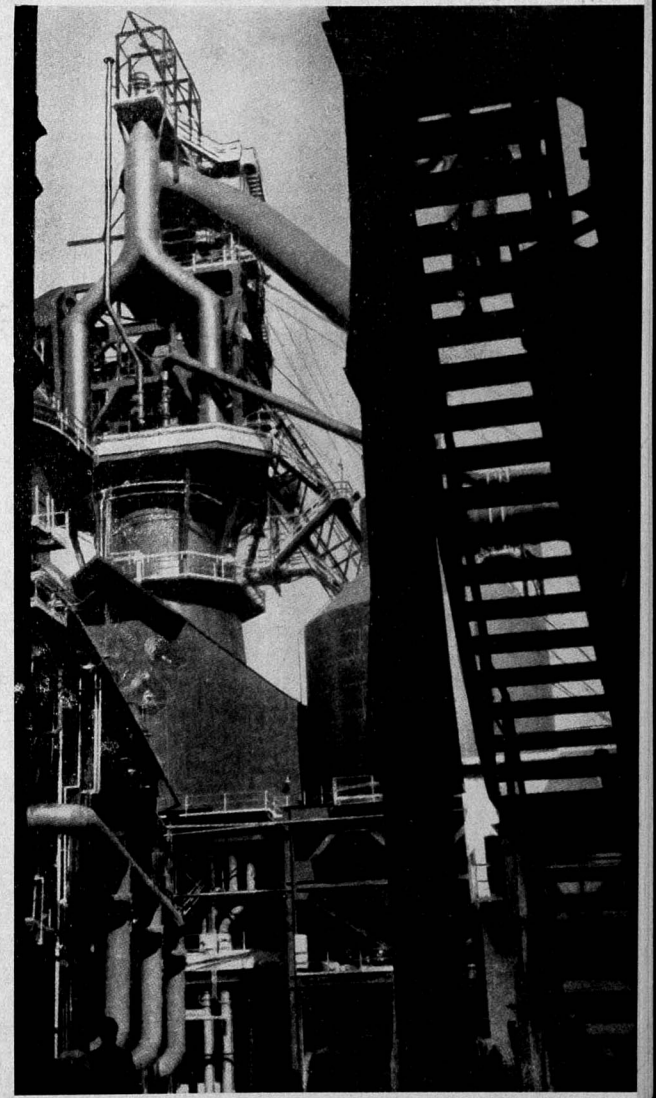

গ্যাওয়ান্দের ওঠানো ইস্পাত সংক্রান্ত যন্ত্রের আর একটি অভিনব আলোকচিত্র।

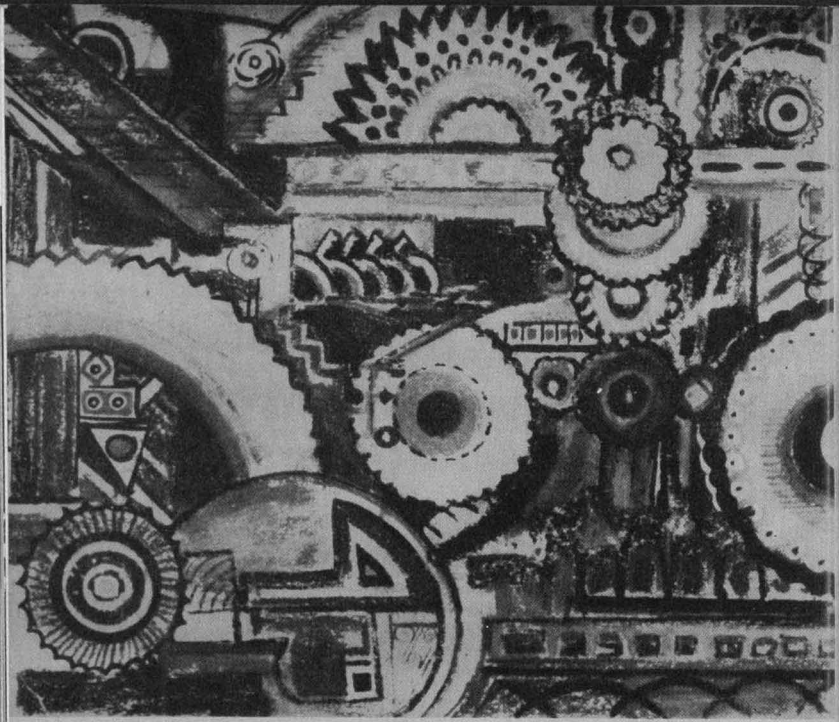

রথীন্দ্র মৈত্রের আঁকা
'ইস্পাতের আলপনা'।

ইস্পাতের আলপনা | সুন্দরম্। দুশো আটাত্তর পৃষ্ঠা। তেরশো সাতষট্টি।

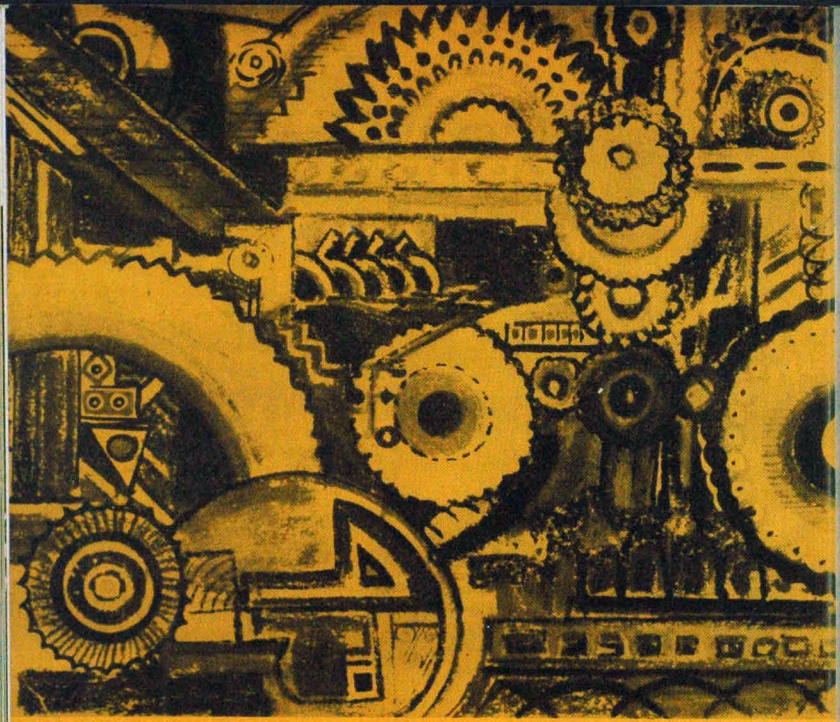

রথীন্দ্র মৈত্রের আঁকা
'ইস্পাতের আলপনা'।

ইস্পাতের আলপনা | সুন্দরম্। দুশো আটাত্তর পৃষ্ঠা। তেরশো সাতষট্টি।

শ্রীযুক্ত ষোড়ষীকুমার সরস্বতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত তমলুকের একটি টেরাকোটা মূর্তির আলোকচিত্র।

বাংলার পোড়ামাটীর মূর্তি ও চিত্রদর্শণ

সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ তার শিল্পসৃষ্টির বাসনাকে যে-সমস্ত মাধ্যমে রূপায়িত করে এসেছে, টেরাকোটা বা পোড়ামাটি (সূর্যের আলোয় অথবা আগুনে পোড়া) তাদের অন্যতম। সহজলভ্য এবং স্বচ্ছন্দ ব্যবহার্য বলে মাটিকে মানুষ শিল্পায়নের কাজে কত বেশি রকম কাজে লাগিয়েছে, দেশ-বিদেশের শিল্পের ইতিহাস-ই তার নির্ভ্রান্ত সাক্ষ্য দান করে। মিনোস ও প্রাচীন গ্রীস, ইজিপ্ট, ইরাণ ও মেসোপটেমিয়া, চীন, পলিনেশিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাচীন দেশের শিল্পভাণ্ডার পোড়ামাটির মূর্তির বিপুল ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। ভারতবর্ষের শিল্প-ঐতিহ্যেও পোড়ামাটির মূর্তি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে—প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতারও আগে—বেলুচিস্তানের কুল্লি, ঝোব্ প্রভৃতি কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার কেন্দ্রসমূহের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে-সমস্ত পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গেছে, তা অন্যান্য প্রাচীন দেশের পোড়ামাটির মূর্তি-শিল্পের মতোই শিল্পমূল্যে সম্পন্ন। এবং বলা বাহুল্য কুল্লি, ঝোব্ ইত্যাদি কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত এই সব টেরাকোটা মূর্তিই ভারতবর্ষের শিল্পচর্যার আদি নিদর্শন।

মনে হয়, কুল্লি-ঝোব্ সভ্যতার শেষ পর্যায় সিন্ধু-সভ্যতা বা হরপ্পা সংস্কৃতির সূচনাপর্বের সমকালীন এবং কুল্লি-ঝোব্ পর্যায়ের শিল্পধারা হরপ্পার শিল্পীদের হাতে পূর্ণতা লাভ করেছিল। হরপ্পা সংস্কৃতির বিভিন্ন কেন্দ্রে আবিষ্কৃত শিল্প-নিদর্শনের মধ্যে টেরাকোটা মূর্তির প্রাধান্য ও টেরাকোটাশিল্পের জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য। কুল্লি-ঝোব্ ইত্যাদির টেরাকোটা মূর্তির মতো হরপ্পার টেরাকোটা মূর্তিগুলিও নরম মাটিকে ফর্মের প্রয়োজন অনুযায়ী আঙুলের সাহায্যে তৈরি; এদের মধ্যে মানুষী মূর্তিগুলি বেশিরভাগ অলঙ্কার-ভূষিত। কুল্লি-ঝোব্-আদির টেরাকোটা মূর্তির তুলনায় হরপ্পার টেরাকোটা মূর্তিগুলিতে একটা গতির সাবলীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং মডেলিং-এর স্বাভাবিকত্ব লক্ষ করা যায়।

প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতায় কেন, পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতাসমূহের ধ্বংসাবশেষ থেকেও প্রচুর টেরাকোটা মূর্তি পাওয়ার ফলে মনে হয় টেরাকোটা শিল্প ভারতীয় শিল্পীদের—বিশেষত লোক-শিল্পীদের—আত্মপ্রকাশের প্রধান, সহজ ও স্বাভাবিক মাধ্যম রূপে বিবেচিত হতো। মৌর্য যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে হাল আমল পর্যন্ত ঐতিহাসিক যুগের টেরাকোটা মূর্তি গৃহস্থালীর পূজা-উপাসনা, গৃহ-সজ্জা, ইটের বাড়ির দেওয়ালে অলঙ্করণ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার জন্য তৈরি হয়েছে। শিল্পমূল্য ছাড়া ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত এই সব টেরাকোটা শিল্পকৃতি ভারতীয়দের সামাজিক-ও-সাংস্কৃতিক জীবন পর্যালোচনার মূল্যবান উপাদানরূপে পরিগণিত।

এইজন্যই ভারতীয় টেরাকোটা শিল্প সম্পর্কে কোন

গ্রন্থ, বিশেষত এবং স্বভাবতঃই সচিত্র গ্রন্থ, প্রকাশিত হলে উৎসাহিত বোধ করতে হয়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত এ. গোস্বামীর সম্পাদনায় 'ইণ্ডিয়ান টেরাকোটা আর্ট' নামে যে বইটি বেরিয়েছে, তা ভারতীয় শিল্প রসিকদের সন্দিৎসু জাগাতে পারবে বলে মনে হয়। সুখ্যাত শিল্প-সমালোচক অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত পঞ্চাশটি টেরাকোটা শিল্প-নিদর্শনের ব্যাখ্যান-বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া গ্রন্থের সূচনায় 'ইণ্ডিয়ান টেরাকোটা আর্ট', 'হিস্ট্রী অফ ইণ্ডিয়ান টেরাকোটাজ' এবং 'টেরাকোটা ইন্ বেঙ্গল' শীর্ষক যে তিনটি ভূমিকা নিবন্ধক রচনা করেছেন, তা-ও সাধারণ-ভাবে টেরাকোটা শিল্প ও বিশেষভাবে ভারতীয় টেরাকোটা শিল্প সম্পর্কে ধারণা লাভে সহায়তা করে। এই নিবন্ধকত্রয়ের মধ্যে প্রথমটি আমার ভালো লেগেছে।

বিভিন্ন যুগের ভারতীয় টেরাকোটা শিল্পকর্মের পঞ্চাশটি আলোকচিত্র আলোচ্য গ্রন্থের বিশেষ অভি-নন্দনযোগ্য অংশ। আলোকচিত্রক শ্রীযুক্ত অমিয় তরফদার এজন্য আমাদের ধন্যবাদভাজন।

বাংলাদেশের টেরাকোটা শিল্পের ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের কতক পরিচয় শ্রীগোস্বামী সম্পাদিত এই বইটি থেকে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু টেরা-কোটা মূর্তিও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু করে একেবারে গত শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের টেরাকোটা মূর্তির সমাহারে প্রকাশিত ব'লেই সম্ভবত আলোচ্য গ্রন্থের 'ইণ্ডিয়ান টেরাকোটা আর্ট' নামকরণ হয়েছে। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, পঞ্চাশটি নিদর্শনের মধ্যে আটচল্লিশটি-ই বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের নিদর্শন-গুলির অধিকাংশও আবার অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার অন্তর্বর্তী এবং বাংলাদেশের টেরাকোটা আর্টও নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়ান, কিন্তু একটি ব্যাপক অভিধারা এবম্বিধ সংকোচন কতখানি সমর্থ-নীয়? সাধারণ শিল্পরসিকরা এতে বিভ্রান্ত হবে না কি?

গ্রন্থটি সুমুদ্রিত ও পরিচ্ছন্ন। এই ধরনের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য রূপা অ্যান্ড কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ পাবেন।

—গ্রন্থকীট।

যে-সব ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা কোন সমাজের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে; সমাজকে একটা সমপ্রাণতায় বেঁধে রাখে; তাকে তার বিশিষ্ট রূপ দেয়, তাদের সমষ্টিকেই বলা হয় সে-সমাজের সংস্কৃতি বা কাল্‌চার। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও বিবর্তন হয়। ভারতীয় সমাজের ইতিহাস বহু কালের, সুতরাং তার সংস্কৃতির ধারাও দীর্ঘ। ভারতীয় সংস্কৃতি তার দীর্ঘ-পথে বাঁক ফিরেছে অনেকবার; ছোট-বড় উপ-ধারা এসে মিলেছে তাতে; বহু শাখা-প্রশাখা তা থেকে উদ্‌গত হয়ে নানা দিগ্‌দেশে প্রসারিত হয়েছে। তবু তার মূলধারাটি চেনা যায়; বহু রূপান্তরের মধ্যেও ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপটিকে চিনে নেওয়া যায়।

ভারতীয় চিত্রকলা হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির একটা অঙ্গ। ভারতীয় চিত্রকলাকে ভাল করে বুঝতে হলে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। সে-সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে প্রবেশ না থাকলে, সেই সেই পর্যায়ের চিত্রশিল্পের পুরো রস গ্রহণ করা অত্যন্ত দুরূহ, প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। তবে, সংস্কৃতির মূল ধারাতে মাত্র প্রবেশ থাকলেই, শিল্পকর্মের মোটা-মুটি রস গ্রহণ অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে।

শিল্পকর্ম মূলতঃ চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের জন্যেই নয়; তার আবেদন সমগ্র সত্তার কাছে; সমগ্র সত্তাকে উদ্বোধিত করতে পারলেই তার সার্থকতা। বিশেষতঃ, শিল্পকর্ম বোধগম্য হওয়া চাই। শিল্পকর্মের মধ্যে নিহিত শিল্পী-আত্মার উল্লাস, তার রস ঠিকমত গ্রহণ করার জন্যে, যে-সমাজের মধ্যে সে-শিল্পকর্মের উদ্‌ভব সেই সমাজের ভাবচিন্তার মধ্যে প্রবেশ থাকা চাই। একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে কথাটা বোঝা যাক্। 'করালবদনা ঘোরা মুণ্ডমালা বিভূষিতা' কালীমূর্তির সার্থকতা সে কি করে বুঝবে, তান্ত্রিক সংস্কৃতির মধ্যে যার প্রবেশ নাই? বৈষ্ণব ভাবধারার সঙ্গে যার পরিচয় নাই, সে রাসলীলাকে 'কামলীলা' আখ্যা দিলে, বিস্ময়ের কি আছে? পশ্চিমী পণ্ডিতদের অনেকেই এবং তাঁদের ভারতীয় ভক্তরা যে ভারতীয় শিল্পের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝতে পারেন না তার একমাত্র কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির—তার বিভিন্ন পর্যায়ের-সঙ্গে তাঁদের যথোপ-যুক্ত পরিচয় ছিল না। আমরা ইউরোপীয় সঙ্গীতকে

শৃগালের ক্রন্দন বলে মনে করি, প্রধানতঃ তার ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের তেমন নিবিড় যোগ নাই বলে।

শ্রীযুক্ত কানাই সামন্তের চিত্রদর্শনের একটা বিশেষ গুরুত্ব হচ্ছে এই যে তিনি "সিন্ধু সভ্যতার কাল থেকে আজ অবধি যে ভারতীয় চিত্রকলা ক্রমবিকশিত হয়ে উঠেছে তারই ভাবলাবণ্য, তারই অপরূপ শ্রী ও তাৎপর্য, তার সাধনা ও সিদ্ধি'কে "ভারতীয় ধ্যান জ্ঞান, সাধনা ও সংস্কৃতির ভূমিকায় বুঝতে ও বোঝাতে" চেষ্টা করেছেন এবং সাধারণভাবে তাঁর সে-চেষ্টা ফলবতীও হয়েছে। "অজন্তায় গুহাচিত্রের সঙ্গে কালীঘাটে পটের সাজাতা" এবং অবনীন্দ্র নন্দলালের চিত্রের নাড়ীর যোগ দেখাতে তিনি সত্যিই অনেকটা সমর্থ হয়েছেন। 'অনেকটা' বলছি এই কারণে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই—তার উপকরণ এখনও ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে আছে, সুতরাং ভারতের কোনো শিল্পকলার বিকাশ-ধারা ঠিকমত নির্দেশ করা আজও বেশ দুরূহ। সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে, এ কথা নিঃশংসয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির, সুতরাং তার শিল্পকলার, একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা, প্রাক্‌বৈদিক যুগ থেকে একাল পর্যন্ত চলে এসেছে। প্রাক্‌-বৈদিক 'দেশী'য় ধর্মগত ও শিল্পগত সংস্কৃতির ধারা 'আর্য'-বৈদিক বন্যায় ভেসে যায় নাই, কিছুকালের জন্যে হয়তো তলিয়ে গিয়েছিল, পরে 'দেশী'য় ও 'আর্য' সংস্কৃতির মিশ্রণে একটা প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হয়—জৈন-বৌদ্ধ যুগের মূর্তিশিল্পের মধ্যে আর একটা প্রকৃষ্ট পরিচয় রয়েছে।

শুধু মূর্তিশিল্পগত সংস্কৃতির কথাই ধরা যাক্। প্রাচীনকাল থেকেই, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র, শিল্প হয়ে এসেছে ধর্মাশ্রয়ী ও বৈদিক 'আর্য'-রা এদেশে প্রভাব স্থাপন করার সময় বৈদিক ধর্ম ছিল অপৌত্তলিক—'দেশী'য় সিন্ধুসভ্যতায় ধর্ম ছিল না। সুতরাং বৈদিক 'আর্য'দের আধিপত্যের সময়ে তাদের মধ্যে মূর্তি-শিল্পের চর্চা বিশেষ হয় নাই, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে; কিন্তু 'দেশী'য়দের মধ্যে সে চর্চা যে বন্ধ হয় নাই, তার প্রমাণ পাওয়া গেল বৈদিক জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থানের কিছুকালের মধ্যে। উপনিষদ্-যুগের আর্যরা স্পষ্টই বলছেনঃ "যম্ মনসা ন মনুতে" যাঁকে আমরা মন দিয়ে ভাবি, তিনি ব্রহ্ম নন। তবু 'মূর্তম্ চামূর্তম্', 'মর্ত্যম্ চামর্তম্' ব্রহ্মের ধারণাও ঐ যুগের। মূর্ত ও মর্ত্য ব্রহ্ম হচ্ছে 'অবঙ্‌মানস গোচর'কে ধারণা করার জন্যে। বৌদ্ধরাও বহুকাল বুদ্ধমূর্তি গড়ে নাই —'উদ্দেশিক' বোধিবৃক্ষের বা চৈত্যের সাহায্যে বুদ্ধকে উপাসনা করতেন। জৈন-বৌদ্ধ-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতিক সমন্বয় যুগে—গুপ্তযুগে—ভারতীয় মূর্তি-কলা তার অপরূপ বিকাশ লাভ করে।

আমাদের বাংলার কথায় আসা যাক্। বাংলায় পালযুগের মূর্তিকলা যে ঘনিষ্টভাবেই গুপ্তযুগের মূর্তিকলার ধারাবাহী, একথা সহজেই বোঝা যায়। (একটা পুরানো তিব্বতী কিম্বদন্তী অনুসারে) বাংলার মূর্তিশিল্প ছিল চীনা, তিব্বতী বা নেপালী মূর্তিকলার চেয়ে সেরা। সে মূর্তিকলায় বহু অসামান্য নিদর্শন—কত বুদ্ধ, বিষ্ণু, সূর্য, গনেশ, তারা প্রভৃতির মূর্তি—আজও এদেশের পল্লী-অঞ্চলের মাঠে-ঘাটে, রুচিৎ সিন্দুর মেখে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কেন এমন হল? বাঙালী সমাজের সৌন্দর্যবুদ্ধি ক্রমেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে কি? তা নয়। ঐ মূর্তিগুলি সংস্কৃতির যে পর্যায়ের মধ্যে ফুটে উঠেছিল সে-পর্যায় বাংলায় মুসলিম-অভিযানের পর, ধীরে ধীরে, শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে। পর্যায় শেষ হলেও সংস্কৃতির ধারাটি লোকজীবন থেকে লুপ্ত হয় নি। পাল-সেন যুগের মত অপৌত্তলিক মুসলিম-দের প্রাধান্যের যুগেও পাথর কেটে ব্যয় সাপেক্ষ মূর্তি-গড়ার রেওয়াজ না চলাই স্বাভাবিক। সুতরাং পৌত্তলিক দেশীয়রা প্রধানতঃ মাটির মূর্তি গড়েছে, পোড়া-মাটির মূর্তিও অল্পবিস্তর রচনা করেছে, দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্র, দেবদেবীর পট প্রভৃতি এঁকেছে। নানা পূজাপার্বণে আল্পনাচিত্র করেই তুষ্ট থেকেছে। মোট-কথা, বাংলায় শিল্প-সংস্কৃতির ধারা মরে নি, লোক-জীবনে, হয়তো বা সংকীর্ণতর হয়ে, একটা মোড় ফিরেছে।

ইংরেজ আমলে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘাতে, নবাবী আমলের বাঙালীর শিল্প-সংস্কৃতিতে আবার একটা নতুন বাঁক ফিরেছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রের মাইকেল-বঙ্কিমের মতই রূপকথার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্র-নন্দলালের আবির্ভাব ঘটেছে, 'দেশী'য় ও 'আর্য' পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে।

এ'দের প্রতিভার মূল রহস্য এই যে, এ'রা দেশীয় প্রাণশক্তি ও তার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধাক্কাটা হজম করেছেন।

এখানে ঠিক প্রাসঙ্গিক না হলে একটা ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ধর্মাশ্রয়ী সমাজে শিল্পকর্মগুলি আজ আশ্রয় পেয়েছে 'মিউজিয়মে'—একদা যেগুলি ছিল সমাজ-জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সমাজের প্রয়োজনেই আসে শিল্প; সমাজের প্রাণশক্তির প্রকাশ পাওয়া শিল্পে আবার যে-শক্তির উদ্বোধকও ঐ শিল্প—মিউজিয়মে ভীড় করা বা ধনীর গৃহের শোভাবর্ধন করার মধ্যে তার সার্থকতা নয়। নূতন দিনের শিল্প যদি এ কালের সমাজজীবনের পরিপোষক না হয়, তবে তাও মিউজিয়মে-রক্ষিত ধর্মাশ্রয়ী সমাজের শিল্পের মতই প্রায়-ব্যর্থ। আমার কথা থেকে এরকম সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে যে, সত্যিকার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলির আবেদন সার্বমানসিক নয় বা সার্বকালীন নয়।

'চিত্রদর্শন' পড়ে যে সব কথা মনে উঠেছিল, কিছুটা বলে ফেললাম। এ সবই যে এই গ্রন্থে আছে, তা নয়। তবে, এ গ্রন্থ পড়তে গিয়ে এগুলি আমার মনে জেগেছিল। সুতরাং গ্রন্থখানিকে চিন্তা-উদ্বোধক বলে স্বীকার করতেই হচ্ছে।

'চিত্রদর্শন' নামটি দুই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এ গ্রন্থে "চিত্র দেখার আনন্দময় অভিজ্ঞতায় যেমন আকৃষ্ট করা হয়েছে পাঠককে, চিত্রের তত্ত্ব-ভাবনা বা ধারণাতেও তাঁকে উৎসুক উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।" মলাটের ভিতর দিয়ে গ্রন্থের এই যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তা যথার্থ। 'শিল্পের স্বরূপ', 'চিত্র', 'চিত্রসত্তাবলী' এই তিনটি অধ্যায় বিশেষতঃ তত্ত্ব নিয়ে। বাকীগুলিতে মুখ্যতঃ ভারতীয় চিত্রকলা এবং বিশেষতঃ আধুনিক চিত্রকলার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। লেখকের চিন্তায় সতর্কতা ও তা প্রকাশের প্রসাদগুণময় ঋজুতার গুণে প্রতিটি প্রসঙ্গই, একই সঙ্গে বুদ্ধি ও হৃদয়ের গ্রাহ্য হয়েছে। তাঁর নিজের বুঝ-এ ভেজাল নেই বলে তিনি কোথাও ধোঁয়ার সৃষ্টি করেন নি। তার জন্যে বাংলায় পাঠকদের তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

'চিত্রদর্শন' গভীর মনোনিবেশ করে পড়বার মত বই। সেইভাবেই আমরা তা পড়ার চেষ্টা করেছি। সর্বত্রই যে তাঁর কথাকে মেনে নিতে পেরেছি, এমন নয়। ছোটখাট কয়েকটি ব্যাপারেই তাঁর কথায় আপত্তি করা চলে; মূল ব্যাপারে অবশ্য নয়। এখন আমাদের দুই-একটা অভিযোগও তুলব :

প্রথমতঃ, ১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকটির ব্যাখ্যায় সুপণ্ডিত লেখক যেন অকারণে এবং অজানিতে স্ত্রীজাতি ও জনসাধারণ সম্বন্ধে একটু অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করেছেন। শাস্ত্রকার বলেছেন, চিত্রে স্ত্রীলোকরা 'ভূষণ' ইচ্ছা করে,—এখানে লেখক 'ভূষণ'কে খণ্ডন অর্থে মাত্র নিয়েছেন, "সমুদায় চিত্রে—ওতপ্রোত খণ্ডন" অর্থকেও আমরা যথেষ্ট বলে মনে করি না। রাজমূর্তির হলো ভূষণ মুকুট, বিপ্রের উপবীত। উপবীত 'খণ্ডন' হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব রাখে না, কিন্তু 'ভূষণ' হিসেবে রাখে। ওটা না থাকলে বিপ্র সাধারণ হয়ে যায়; তাকে তার উপবীতটাই 'ভূষিত' বা ভূয়স্কারার্হি—তাকে মহিমা-যুক্ত করে। কোনও জিনিষ না থাকায় খুঁত থেকে গেলে, সেটা মেয়েদেরই চোখে পড়ে বেশী করে। সমুদায় চিনে ওতপ্রোত সুষমা তো চায় সকলেই, শুধু মেয়ের কেন? শাস্ত্রকার বলেছেন, ইতর জনেরা 'বর্ণাঢ্যা'তা চায়; লেখক বলেছেন, তারা "বর্ণ-সুষমা ঠিক নয়", "উচ্চগ্রামে বাঁধা রঙচঙ", "প্রবল প্রকট রূপ" চায়। সত্যিকার ভাল কোন চিত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রঙচঙ থাকতেই পারে না; সাধারণ লোকেও তা চায় বলে মনে হয় না। তবে, তারা রঙীন ছবিই সম্ভবতঃ পছন্দ করে বেশী। 'আঢ্য' শব্দের অর্থ 'সম্পন্ন' 'ধনী' মাত্র ধরলে ভুল হয় কি?

১৮৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকের ক্রমারশ-কৃত অনুবাদ সুস্পষ্ট না বটে; লেখক কৃত ব্যাখ্যাও (১৮১ পৃঃ) কিন্তু গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। লেখক তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "একটির অনুসরণে আর একটি এইভাবের **অনুলেখে** গতিতে চিত্রের রূপরাজি যদি **দর্শকের দিকে** এগিয়ে আসে, সে বড়ো প্রশংসনীয়। সম্মুখীন একটি সমতলে রঙিন ছায়াবাজির মতো স্থির বা সঞ্চরণশীল, এভাব যেমন বিশেষভাবে বর্জনীয়, দর্শকের দিকে বা বাহিরে দিকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে আছে এমন হলেও তাৎপর্যের হানি ও ভাবের লাঘব হয়—সুতরাং সেভাবও সযত্নে পরিহার করবে।"

শ্লোক পড়ে আমাদের তো মনে হয়, এর অর্থ : অঙ্কিত মূর্তিগুলিকে তাদের 'আনুলেখ্যে' অনুযায়ী অর্থাৎ সামাজিক পদমর্যাদা অনুযায়ী সাজানো প্রশংসনীয়। যথা, মহেশ্বর বসবেন কেন্দ্রে, তাঁর পাশে একের পর এক বড় থেকে ছোট দেবেরা, তার পর গন্ধর্ব-কিন্নররা; অথবা রাজা থাকবেন চিহ্নিত শোভাযাত্রার সর্বাগ্রে; তাঁর পরে মন্ত্রীরা, সেনাপতিরা...। 'আনুলেখ্যে' শব্দটিতে বর্ণ-গত সুতরাং সামাজিক পদমর্যাদাগত তারতম্যের প্রতি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। অঙ্কিত মূর্তিগুলির 'সম্মুখত্ব' অর্থাৎ পরস্পর মুখোমুখি ভাব বর্জনীয়। (কারণ, তার ফলে, দুই মূর্তি থাকলে, একটা মূর্তি আর একটাকে কিছুটা ঢেকে ফেলবে; বা দুই মূর্তিরই একটা দিক মাত্র দেখা যাবে।)

'চিত্রদর্শনে' 'কারুকলা' বলে একটা প্রবন্ধ রয়েছে, ঐ শব্দটির কোন সংজ্ঞা লেখক দেন নাই। সম্ভবতঃ, তিনি 'শিল্পীর' চারুকলা' থেকে 'কারিগরের' 'কারুকলাকে' বিশেষিত করেন। অথচ, 'কারু' শব্দের অভিধান-ধৃত অর্থ হল শিল্পী আর 'কলা' শব্দটির উদ্ভব সম্ভবতঃ 'কৃ' ধাতু থেকেই; তা হলে 'কারু কথার' অর্থ হয়—শিল্পীর-কাজ। যাকেই, চারুকলা ও কারুকলার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে মার্গারেট মীডের একটা কথা মনে পড়েছেঃ

"সুকুমার শিল্পে শিল্পী আর সুকুমার শিল্প—এ দুইটি ধারণাই হচ্ছে স্থানীয় ইউরোপীয় ঐতিহ্যের বিশেষ দুর্ঘটনা (স্পেশাল্ ব্যাড্ অ্যাক্সিডেন্টস্)।"

আলপনা সম্পর্কে লেখক বলেছেন "আলিপনা চিত্র নয়। চিত্রকলার সীমান্ত প্রদেশ ভূষিত করছে মাত্র।" (১৯৭ পৃঃ) আমরা বলি আলপনা যদি চিত্র নয়, রেখাচিত্রও চিত্র নয়। এখনও বাংলার মেয়েরা কোজাগরী পূর্ণিমায় যে-রকম 'লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ' আঁকেন, শুধু তাই দেখলে বোঝা যায় আল্পনাও চিত্র। মানুষের মত পায়ের ছাপ, কিন্তু ঠিক মানুষের নয়—প্রায় ছন্দিত রেখায় একটা দেবীর প্রসাদ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

ঝগড়া হল অনেক। তাই পরিশেষে, আবার স্বীকার করতে চাই—লেখক চিত্রের রস নিজে বুঝে অন্যকে বোঝাতে চেয়েছেন এবং তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা ও রচনার অপরূপ প্রসাদগুণে তাতে সাফল্যও লাভ করেছেন। এতগুলি উৎকৃষ্ট চিত্রও একাধারে বাংলা কোন গ্রন্থে পাই নি। বাংলা ভাষায় এ রকম একটা গ্রন্থ পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করছি। **—শুভেন্দু ঘোষ।**

১। **ইণ্ডিয়ান টেরাকোটা আর্ট : এ. গোস্বামী।**
রূপা অ্যাণ্ড কোং। দাম ৩২ টাকা।

২। **চিত্রদর্শণ : কানাই সামন্ত।**
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী। দাম ২৫ টাকা।

ফুল নয়, দুল নয়, হে প্রিয়! —উপহার যদি দিতে হয়, তবে বই দিও!

সঙ্গীতপ্রেমী রবিশঙ্কর

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় সংগীত সম্পর্কে প্রবন্ধকার মুষ্টিমেয় যে কয়জন আছেন, সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের পুরোভাগে। সংগীত সম্পর্কে বাংলার অগ্রণী পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লেখেন। ব্যক্তিগতভাবে নিজে সংগীতজ্ঞ।

দেশের সংগীতক্ষেত্র ছাপিয়ে যেসব শিল্পীর সুনাম বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের প্রতিভা সম্বন্ধে সংশয় থাকতে পারে না। প্রকৃত কথা বলতে কি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনের সৌভাগ্য খুব কম ভারতীয় সংগীতজ্ঞেরই হয়েছে। মুষ্টিমেয় যে কয়জন শিল্পীর ভাগ্যে এই ব্যাপক সুনাম আহরণ করা সম্ভব হয়েছে তাঁদের মধ্যে সেতারশিল্পী রবিশঙ্করের স্থান যথেষ্ট ঊর্ধ্বে বলা চলে। তাঁর খ্যাতির ভিত এত পরিব্যাপ্ত যে পৃথিবীর খুব কম অংশই তা থেকে বাদ পড়ে। এই বিশ্বপরিচিতির বনেদ যে এক দিনে গড়ে ওঠে নি তা তাঁর জীবনবৃত্তান্ত অনুসরণ করলেই বোঝা যায়।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল বারাণসীধামে রবিশঙ্করের জন্ম। তাঁর পৈতৃক ভিটা যশোর জেলার কালিয়াগ্রামে। কিন্তু সেখানে রবিশঙ্কর কখনও গেছেন কি না সন্দেহ। পিতা শ্যামশঙ্কর চৌধুরী ছিলেন সংস্কৃতে প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং পাণ্ডিত্যের পুঁজি বাড়াতে তিনি হয়তো স্বগ্রামে অবস্থান বিশেষ সমীচীন মনে করেন নি। চৌধুরী ছিল তাঁর জমিদারী খেতাব, আসলে তিনি ছিলেন চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তী কালে যখন তিনি ঝালোয়ার রাজ্যে মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন, তখন তিনি দেখলেন যে চৌধুরী অর্থে মেথর বা ঝাড়ুদার শ্রেণীর লোককে বোঝায়। তারপর থেকেই চৌধুরী পদবী পরিত্যক্ত হলো এবং তার ফলেই রবিশঙ্কর চৌধুরীকে আমরা রবিশঙ্কর নামেই জানি।

শ্যামশঙ্করের চার পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ রবিশঙ্করের প্রতিভা যে সংগীতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে তা হয়তো তিনি জানতেন না এবং সেই কারণে তিনি রবির বিদ্যাভ্যাসের প্রতি নজর দেওয়া সংগত মনে করলেন। অপর তিন পুত্র উদয়শঙ্কর, রাজেন্দ্রশঙ্কর ও দেবেন্দ্রশঙ্কর ছিলেন নৃত্যের পূজারী এবং এই হিসেবেই পরবর্তী কালে তাঁরা কৃতিত্বের অধিকারী হন।

নৃত্যবিদ্ উদয়শঙ্করের প্রতিভা যখন ভারতের অনুরাগী মহলে আলোড়ন তুলেছে তখন রবিশঙ্কর কাশীর বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠে নিমগ্ন। এই নীরস প্রচেষ্টার মধ্যে ১৯২৯ সালে উদয়শঙ্কর ফিরে এলেন ইউরোপ থেকে প্রভূত যশের অধিকারী হোয়ে এবং এসেই তিনি নিজস্ব দল গঠনের ব্যাপারে মনোনিবেশ করলেন। সান্নিধ্যের সুযোগ পেয়ে রবির উর্বর মস্তিষ্ক সংগীতযন্ত্রগুলির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করতে কার্পণ্য করতো না। ফলে হয়তো তাঁর পাঠাভ্যাসে বাধা সৃষ্টি হতো, কিন্তু বালকসুলভ এই আগ্রহের জন্যই যে পরোক্ষভাবে তাঁর মনে সংগীতের ভিত তৈরী হয়েছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

রবিশঙ্করের সংগীত সম্বন্ধে এই সচেতনতা লক্ষ করে উদয়শঙ্কর নানাভাবে তাঁকে উৎসাহ দিতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত বালক রবির স্থান নাচের দলেই হয়ে যায়। ইতিমধ্যে নানা ধরনের যন্ত্র বাজাবার কৃতিত্ব অর্জন করাতে দাদার দলের নৃত্যসংগীত পরিবেশনে তিনি বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠলেন। শুধু চোখে দেখে নৃত্যের আঙ্গিকও তিনি বেশ খানিকটা আয়ত্ত করে ফেললেন এবং এইজন্য দাদার দলে কয়েকটি নৃত্যে আত্মপ্রকাশ করতে তাঁর পক্ষে কোনও বাধার সৃষ্টি হয় নি। এ বিষয়ে তাঁর অনুরাগী মন ক্রমেই এগিয়ে চললো নূতন সৃষ্টির অন্বেষণে। তাঁর রচিত "চিত্রসেনা" নৃত্যই তার পরিচয়। পরবর্তী কালে উদয়শঙ্করের দলের সঙ্গে যখন রবিশঙ্কর ভারতের বাইরে যান তখন এই নৃত্যটি আমেরিকার রসিকমহলে বিশেষ সমাদর লাভ করে।

রবিশঙ্কর ও অপর তিন ভ্রাতার অনুরাগী মন যে নিজ নিজ ক্ষেত্রে পারিবারিক অনুকূল আবহাওয়ার ফলেই গড়ে উঠেছিল তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। পিতা ছিলেন একাধারে শিল্পী, দার্শনিক এবং ব্যারিস্টার। সংস্কৃতে অতুল পাণ্ডিত্যের জন্য বারাণসী থেকে তিনি বিদ্যাভূষণ উপাধি লাভ করেন এবং সেখানকারই মিঠাইলাল নামক একজন সঙ্গীতজ্ঞের কাছে কিছু ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। প্রকাশ, পুরাতন রীতি অনুযায়ী সামগান তিনি অতি কৃতিত্বের সহিত পরিবেশন করতে পারতেন। সঙ্গীতকে তিনি জ্ঞানধর্মী মনে করতেন বোলে বিদ্যাপ্রচারের অহেতুক চাঞ্চল্য তাঁর ছিল না। মস্তিষ্ক দিয়ে গ্রহণ কোরে তিনি তা অন্তরের মণি-কোঠায় বেঁধে রাখতেন এবং তাতেই তাঁর ছিল পরম তৃপ্তি। খুব কম লোকই তাঁর এই সঙ্গীতপ্রেমী মনের সন্ধান পেতো।

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনের সময় শ্যাম-শঙ্কর ছিলেন পণ্ডিত মালব্যের ঘনিষ্ঠ সহচর এবং বহুভাবে তিনি এই মহান প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। সম্ভাবনার বীজ বপন কোরে তিনি তারপর চলে গেলেন ঝালোয়ার রাজ্যে মন্ত্রিত্বের পদ নিয়ে। এর পর তিনি যান ইওরোপে এবং সেখানে ১৯৩৫ সালে ইহলীলা সংবরণ করেন। লণ্ডনে থাকা-কালীন ভারতীয় প্রথায় 'আবু হোসেনের স্বপ্ন' নামক একটি নৃত্যনাট্যের রূপদান তিনি অতি কৃতিত্বের সহিত করেছিলেন। প্রকাশ, এই নাচ দেখেই প্রথিতযশা রুশ নর্তকী এনা পাভলোভা ভারতীয় নৃত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরোক্ষে এই নৃত্যপ্রচেষ্টার ফলেই যে উদয়-শঙ্কর উক্ত রুশ নর্তকীর সহায়তা লাভ করেন এবং পরবর্তী কালে নৃত্যরূপায়ণে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন সে কথা রবিশঙ্করের মুখে শুনেছি। আর শুনেছি মাতা হেমাঙ্গিনী দেবীর অফুরন্ত সঙ্গীতচেতনতা। তিনি ছিলেন গাজীপুর-নিবাসী এক সম্ভ্রান্ত পরি-বারের কন্যা। এই পরিবারের উত্তরাধিকারিগণ যে উপযুক্ত মনোভাব নিয়ে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে!

দাদার দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার ফলে রবিশঙ্করের নৃত্যানুরাগ ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং তারই তাগিদে তিনি কিছুদিনের জন্য গুরু শঙ্করণ নাম্বুদ্রীর কাছে কথাকলির আঙ্গিক শিক্ষা করেন। এই সুযোগ তাঁর এসেছিল দাদার দলের সংস্পর্শেই, কারণ কথাকলির উক্ত গুরুর সান্নিধ্য তিনি সেখান থেকেই পান। কিন্তু সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে নৃত্যকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে রবিশঙ্করের মন প্রথম থেকেই তেমন সায় দেয় নি। কেমন যেন এক অপূর্ণতা তাঁর মনের গহনে বাসা বেঁধে ছিল।

ঠিক এই সময়ে দাদার দলে ১৯৩৫ সালে যোগ দিলেন মাইহারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সরোদশিল্পী আলাউদ্দীন খাঁ। উদয়শঙ্করের আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে মাইহারের এই অপ্রতিম সরোদশিল্পী যা কোরেছেন তার বেশি কোরেছেন রবিশঙ্করের সক্রিয় মনকে যন্ত্রসঙ্গীতের দেউলে স্থায়ীভাবে টেনে এনে। আলাউদ্দীন খাঁর সঙ্গে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ কোরে এবং তাঁর যন্ত্রসঙ্গীতের সুনিবিড় স্বাদ পেয়ে রবিশঙ্কর ঠিক করলেন যে যন্ত্র-সঙ্গীতই তিনি শিখবেন। আলাউদ্দীন খাঁকে অচিরেই তিনি সে কথা জানালেন, কিন্তু প্রত্যুত্তরে যে-সমস্যার উদ্ভব হলো কিশোর রবিশঙ্করের মন তাতে মথিত হয়ে পড়লো। আলাউদ্দীন খাঁ স্পষ্টভাবে শিক্ষাথীকে জানিয়ে দিলেন যে, সঙ্গীত সাধনার বস্তু, বিক্ষিপ্তভাবে তা শিক্ষা করলে সঠিক মর্মোপলব্ধি হয় না এবং সেই-জন্য নৃত্য তাঁকে ছাড়তে হবে।

রবিশঙ্করের মন অন্তর্দ্বন্দ্বের দোলায় দোলায়মান। নৃত্যের মাধ্যমে তিনি ইতিমধ্যে যে খ্যাতি অর্জন কোরে-ছিলেন তা অগ্রাহ্য করার নয়, অথচ মন পড়ে আছে সঙ্গীতের দেউলে। কাকে রাখেন, কাকে বিসর্জন দেন তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা তাঁর পক্ষে এক বিশেষ সমস্যা হোয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু মনের অন্তর্দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন রবিশঙ্কর। নৃত্য পরিত্যাগ কোরে সঙ্গীতকেই আকড়ে ধরবার মতো মন তিনি তৈরী করলেন অনেক চিন্তার পর। তাঁর খ্যাতির ক্ষতি হয়তো তাতে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সঙ্গীতের মোহ তাঁকে লক্ষভ্রষ্ট করতে পারলো না। রবিশঙ্কর এলেন মাইহারে এবং আলাউদ্দীন খাঁকে বরণ করলেন গুরুরূপে।

যন্ত্রসঙ্গীতের শিক্ষণ শুরু হলো সেতারের মাধ্যমে। এই যন্ত্রটির প্রতি রবিশঙ্করের অনুরাগ বহুপূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিল তিমিরবরণের গৃহে তাঁর ভাইপো অমিয়-কান্তি ভট্টাচার্যের সেতার বাজনা শুনে। যন্ত্র চয়নের

ব্যাপারে সম্ভবতঃ রবিশঙ্কর নিজ অভিরুচিকেই প্রাধান্য দেওয়া শ্রেয় মনে করেছিলেন এবং সেইজন্যই সরোদশিল্পীর কাছে সেতার শিক্ষার প্রচেষ্টা তাঁর বিফলে যায় নি, যদিও সুরপ্রয়োগ ও অঙ্গুলিচালনার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ধারা রবিশঙ্করের বাজনায় অনেকে লক্ষ্য করে থাকেন। আলাউদ্দীন খাঁ শিক্ষার্থীর উৎসাহ ও অনুরাগ দেখে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগলেন। একটানা প্রায় সাত বৎসর গুরুগৃহে চললো রবিশঙ্করের সঙ্গীতসাধনা। এই সময়ে তিনি প্রতি-দিন বারো থেকে পনেরো ঘণ্টা রেওয়াজ করতেন। যন্ত্রসঙ্গীতের মর্মস্থলে পৌঁছোতে হলে আঙ্গিক বা টেকনিকের উপর পূর্ণ অধিকার থাকা দরকার এবং এই-ভাবে টেকনিকের ঊর্ধ্বে না উঠলে যন্ত্রসঙ্গীতে রসের অবতারণা করা অসম্ভব। এই উপলব্ধি রবিশঙ্করের ছিল বলেই রেওয়াজের ব্যাপারে তিনি পশ্চাৎপদ হন নি। শিক্ষার এই কণ্টকর অবস্থার মধ্যে ১৯৪১ সালে গুরুদেবের কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণার সঙ্গে আল-মোড়াতে রবিশঙ্করের শুভ পরিণয় হয়। আলাউদ্দীন খাঁর সহিত এইভাবে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াতে রবিশঙ্করের সঙ্গীতপ্রতিভার দীপ্তি ক্রমেই উজ্জ্বলতর হতে থাকে। কারণ শ্রীমতী অন্নপূর্ণাও ছিলেন সুরবাহারের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী।

নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ফলে রবিশঙ্কর যখন স্বাধীন-ভাবে সঙ্গীত পরিবেশনের অধিকার অর্জন করলেন তখন তাঁর মনে উদয় হলো প্রতিষ্ঠালাভের আগ্রহ। ছায়াচিত্রে সুরারোপ করতে তিনি ১৯৪৪ সালে এলেন বোম্বাইয়ে। সুর দিলেন আই-পি-টি-এ প্রযোজিত "ধরতী কে লাল" ও "নীচা নগর" নামক চিত্রে। একক সেতার বাজনার ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত না কোরে, সুরপ্রয়োগের পথ তিনি সম্ভবতঃ বেছে নিলেন অর্থাগমের তাগিদে। কিন্তু এই সুযোগে বিভিন্ন যন্ত্রের সামূহিক প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করলেন। এই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগে নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া গেল তার পরবর্তী প্রচেষ্টা "ডিস্‌কভারি অব্ ইন্ডিয়া" নামক নৃত্যনাট্যের অর্কেস্ট্রা সৃষ্টিতে। বোঝা গেল সামূহিক সঙ্গীত সৃষ্টিতে নূতনত্বের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

এর পরই এলো অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে আহ্বান। ১৯৪৯ সালে রবিশঙ্কর দিল্লী রেডিওতে 'কম্পোজার' বা যন্ত্রসঙ্গীতের সুরকার পদে নিযুক্ত হলেন। এই কার্যে নিযুক্ত থাকাকালীন তাঁর সৃষ্ট সুরের সমারোহ প্রধানতঃ ভারতের বাইরে শ্রোতাদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছিল বলেই পরবর্তী কালে বিদেশ থেকে বহু আমন্ত্রণ আসতে থাকে। এবারে তিনি ঠিক করলেন যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ কোরে ব্যক্তিগতভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য প্রচার করবেন। বিশ্বের দরবারে ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু রবিশঙ্কর এ কাজে পশ্চাৎ-পদ হলেন না। ১৯৫৪ সালে তিনি গেলেন রাশিয়ায়। তারপর ১৯৫৭ সালে ইওরোপ ও আমেরিকা এবং তারও পর গত বৎসর তিনি জাপান পরিভ্রমণ করলেন। ভারতীয় রাগসঙ্গীতের রূপায়ণ সেতারের সাহায্যে এককভাবে বিদেশীয়দের কাছে পরিবেশন কোরে তিনি যে সুনাম অর্জন করেছেন তার তুলনা হয় না। তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি যে ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের রাগ-রূপায়ণ বিদেশী শ্রোতাদের কাছে সমাদর পেতে কোনও বাধা নাই, কারণ সে-সঙ্গীতে ভাষাগত কোনও পার্থক্যের প্রকাশ নাই। এইজন্য তিনি মনে করেন যে কণ্ঠ-সঙ্গীতের তুলনায় যন্ত্রসঙ্গীত বিশ্বদরসিকমহলে অধিক সমাদর পাওয়ার উপযোগী।

জাপান পরিভ্রমণ করে রবিশঙ্কর যখন ফিরে আসেন তখন তিনি কলকাতায় কয়েকদিন অবস্থান করেন। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে কিছু আলোচনা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কথার ছলে জানতে পারলাম যে জাপানের প্রতিটি আসরে ভারতীয় সঙ্গীতের মর্ম উপলব্ধি করবার মতো শ্রোতার অভাব ছিল না। ছোট্ট একটি গল্প দিয়ে তিনি এ কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

একটি জাপানী মেয়ে সকালের এক আসরে তাঁর সেতার বাজনা শোনে। সেইদিনই সন্ধ্যায় সে এসে হাজির হলো ভারতীয় দল যে-হোটেলে ছিল। হাতে তার রুমাল দিয়ে ঢাকা কী যেন একটি বস্তু। রুমাল খুলতেই দেখা গেল রবিশঙ্করের এক আবক্ষ প্রতি-মূর্তি। সকলেই যখন মূর্তিটি দেখার ব্যাপারে ব্যস্ত তখন মেয়েটি রবিশঙ্করের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলল, এ সুর সে জীবনে কখনো

শোনেনি। শেষপর্যন্ত সে রবিশঙ্করকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিলো। শিল্পীর অনুভূতি চোখের জলে প্রবাহিত হলো। রবিশঙ্কর বললেন—"সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, যেমন মেয়েটি কাঁদছে, তেমনি আমরাও কাঁদছি।"

জাপানে ভারতীয় সঙ্গীতের মর্মগ্রহণ সম্পর্কে রবিশঙ্কর বললেন যে বিশেষ ধরণের কয়েকটি রাগরাগিণী (প্রধানতঃ বিলাওল ঠাটের) জাপানী শ্রোতাদের অধিক আনন্দ দিতে পারে। এই কারণে তিনি নিম্নলিখিত রাগরাগিণী অধিক পরিমাণে পরিবেশন করেন—ইমন কল্যাণ, পিলু, মাঝ খাম্বাজ, যোগ, ভৈরবী, মালকোশ, গুণকেলী, দুর্গা ও মাগু এবং কীর্তন ও পাহাড়ী গানের সুর। পুরিয়া-ধানেশ্রী বা মাড়োয়াজাতীয় রাগ, শুনলাম, জাপানীরা তেমন গ্রহণ করতে পারে না।

অর্জিত বিদ্যা ছাড়া নবসৃষ্টির প্রেরণা তিনি অনুভব করেন কিনা এই প্রসঙ্গে রবিশঙ্কর বললেন যে, চেষ্টা করে নবসৃষ্টি হয় না। এমন অতর্কিতে আসে নবসৃষ্টির প্রেরণা যে তার পূর্বাভাস টেরই পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বললেন, মোহনকোশ নামে তিনি যে রাগিণীটি সৃষ্টি করেছেন তার কথা। গান্ধীজীর মৃত্যুর পরের দিন তাঁর প্রোগ্রাম ছিল বোম্বাই রেডিওতে। কর্মসচিবের একজন এসে জানালেন যে জাতীয় শোক-সপ্তাহের জন্য বাজনার সঙ্গে তবলা সঙ্গত বর্জিত হয়েছে। রবিশঙ্কর ভাবলেন—কী বাজাই! সেতারের পর্দার উপরে আঙুলগুলির বিভ্রান্তি উপস্থিত হলো। হঠাৎ সা-নি-ধা পর্দা কটির উপর আঙুল খেলে গেলো। আন্দোলিত ধৈবতটি বড় ভালো লাগলো তাঁর। সঙ্গে সেঙ্গ মস্তিষ্ক সজাগ হয়ে উঠলো। শুরু হলো আশপাশের সুর সাজানোর পালা। এইভাবে প্রক্ষিপ্ত আকারে সুরের প্রয়োগ করতে করতে তার মধ্য থেকে ফুটে উঠলো যেন এক নবরাগের আমেজ। ঠিক করলেন এই নব-সৃষ্টিই তিনি বাজাবেন। নামকরণ হলো মোহনকোশ; মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নামে উৎসর্গীকৃত রাগ। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন, তিলকশ্যাম ও বৈরাগী নামে যে দুটি রাগ তিনি সৃষ্টি করেছেন তা-ও অনুরূপ অতর্কিত অবস্থার ফল বলা চলে।

প্রসঙ্গটি আরও প্রসারিত করে তিনি বললেন, প্রধানত ভাবসৃষ্টির দিকেই তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু আঙ্গিক বা টেকনিকের উপর পূর্ণ দখল না এলে এ কাজ সম্ভব নয়। অথচ এ কথাও ঠিক যে আঙ্গিকের ঊর্ধ্বে না উঠলে ভাবসৃষ্টি সম্ভব নয়। এই দুই অবস্থার মধ্য দিয়ে পথ করতে হলে মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় সঙ্গীত ভাবপ্রবণ, শুধু আঙ্গিকের সমষ্টি নয়।

সুরের সঙ্গে আগুণের তফাৎ খুবই কম। বিশেষ সুর আগুণের মতই মনকে পোড়াবার ক্ষমতা রাখে।

তুমি
তখোনো জাগনি...
আকাশ হোয়েছে
ফিকে।

চিকের ফাঁকে ফাঁকে
মরা চাঁদের
আলো
তবু ঘুমুচ্ছ যে?

ওঠো
ওঠো
ওঠো

ভোর!
মুখ ধুতে গিয়ে,
কুলকুচি ওর
আকাশের গা-ময়
গড়িয়ে পড়ছে বেয়ে
চারিদিক ছেয়ে!
সে
পানের পিক!
রাঙিয়ে দেয়—দিগ্‌বিদিক্‌।

ভোরের ছবি

চিত্র ও বিচিত্র

নীলকণ্ঠ

'নীলকণ্ঠ'—এই ছদ্মনামের আড়ালে—অধুনা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে যিনি সাড়া তুলেছেন তিনি বয়েসে এখনো তরুণ। অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। শ্লেষ ও বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতায়, পরিহাসের মাধুর্যে, পাঠক-চিত্তকে আচ্ছন্ন করবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তে।

এক

'বঙ্কিমী স্টাইল বঙ্কিমের লেখা বিষবৃক্ষে, বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন,—বঙ্কিমী ফ্যাশান নসিরামের লেখা "মনোমোহনের মোহন বাগানে", নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি ক'রে।'

সত্যজিতী স্টাইলে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত পথের পাঁচালী; তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন তিনি। সত্যজিতী ফ্যাশানে তোলা একাধিক নিও-রিয়ালিসটিক বাঙলা ছবিতে চলচ্চিত্রজগতের একাধিক নসিরাম সত্যজিৎকে দয়ে বসিয়ে দিয়েছে।

সে স্টাইল টেঁকে না তাই হচ্ছে ফ্যাশান; যে ফ্যাশান টিঁকে যায় তাই হচ্ছে স্টাইল। পরিচ্ছদ থেকে সুরু করে প্রচ্ছদ পর্যন্ত; জামার কাট্ থেকে হেয়ার কাট্ এক প্রায়ই নতুন স্টাইলের প্রবর্তন করেন একজন; অনেকজন মিলে অচিরেই তাকে ফ্যাশন করে তোলে। সমাজের সেই ফ্যাশনেবলরা আবার স্টাইল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশানও বদলায়। ফলে ফ্যাশন টেঁকে না। কিন্তু ওরিজিনল যিনি তিনি তাঁর নিজস্বতায় থাকেন অপরিবর্তিত। তাই স্টাইল চালু করেন তিনি চলে গেলেও জাতির সর্বাঙ্গে তার ছাপ চিরকালের মতো থেকে যায়। বিদ্যাসাগর নেই; বিদ্যাসাগরী চটি ইতিহাস হয়ে আছে।

কেবলু দৈনিক জীবনযাত্রায় নয়। শিল্পসৃষ্টির কুরু-ক্ষেত্রেও কেবল অর্জুন আর কর্ণরাই ইতিহাসের কর্ণধার চিরকাল। বাকী অক্ষৌহিণীরা কালের সাগরজলে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়; কেউ তাদের কথা মনে রাখে না। রবীন্দ্রনাথ আর বার্নাড শ'; প্রাচ্যের আর প্রতীচ্যের এই দুই দিকপালই কেবল আধুনিক কালে নতুন দিকের সন্ধান, নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন স্বার। এদেশে এবং ওদেশে যারা রাবীন্দ্রিক অথবা শেভিয়ান সাজতে গেছে, দাঁড়কাক ময়ূর সাজতে গেলে যা হয়, তার চেয়ে কম সাজা হয়নি। লেখার হাত থেকে হাতের লেখা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দুর্জয় দুরন্ত প্রভাব থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়নি যাদের তারাই রবীন্দ্র-নাথকে যা সাজে তাতে যে তাদের লাঠি বাজে তা বোঝে নি। শয়ের কথা বলবার একটা বিশেষ কায়দা ছিলো; সেই সঙ্গে নতুন কথা ছিলো বলবারও। যারা তাঁকে অনুকরণই করেছে তারা বলবার কথা বাদ দিয়ে কথা বলবার কায়দা আয়ত্ত করতে গিয়েই বেকায়দায় পড়েছে; কথামালার যে গদর্ভ চীৎকার করা মাত্র বিট্রে করেছে সিংহচর্মকে তারা কেবল বিদ্যাসাগরের নয়, জীবনের কথামালাতেও উপস্থিত। এই বিচিত্র জগতের সর্বত্র তো বটেই, জগৎছাড়া চিত্রজগতও এমন সিংহদের হাত থেকে নিস্তার পায়নি যে তার প্রমাণ বহুবার পাওয়া গেছে; এখন আবার পাওয়া যাচ্ছে; এবং ভবিষ্যতেও বারবার পাওয়া যাবে।

তাহলে অনিবার্য, অপরিহার্য সে জিজ্ঞাসা জাগে তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ কি শয়ের মতো মৌলিক প্রতিভা যুগকে প্রভাবিত করবে না? করবে। রবীন্দ্রনাথ কি শয়ের পথ অনুসরণ করে নতুন ধর্ম খুঁজে পাবে যে, নিজের স্বধর্ম; সে আবার নবযুগের প্রবর্তকের দুর্লভ সম্মান পাবে নিঃসংশয়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা শ-কে অন্ধ অনুকরণ করে আসবে না রবীন্দ্রোত্তর যুগ; অথবা অতিক্রান্ত হবে না জি-বি-এস। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াতে উদ্ভট্ শ্লোক বা অর্থহীন স্লোগান উচ্চারণ করবে যে সে পাবে না নতুন যুগস্রষ্টির স্বীকৃতি; তার উক্তি সাধারণের সম্পত্তি হবে না; অসাধারণ স্বগতোক্তি হয়ে উঠতে পারলেও। কারণ নতুন যুগ পুরাতন যুগের ঐতিহ্য অস্বীকার করে আসে না; যেমন আসে না যুগান্তরের কার্বন কপি করে যুগস্রষ্টা; যুগকে আত্মসাৎ করে জন্ম নেয় যুগান্তর।

চলচ্চিত্রে সেই নতুন যুগের,—প্রকৃতপক্ষে বাঙলা ছবির দ্বিতীয় জন্মের অধিবর্তীয় কৃতিত্ব যাঁর তিনিই বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বিচিত্র চিত্রবিস্ময় সত্যজিৎ রায়। বাঙলা ছবির জন্মকাল সত্যজিতের চিত্রজন্মের অনেক কাল আগে বটে তবে এতদিনে তাঁর দ্বিতীয়বার পুন-র্জন্ম হওয়ায় সে দ্বিজত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে সবেমাত্র। এই সত্যজিৎ হচ্ছেন স্টাইল; তাঁর অনস্বীকার্য প্রভাবে বাঙলা ছবির পৃথিবীতে ঋতুবদল হবে,—এ অত্যন্ত স্বাভাবিক, নিতান্ত সঙ্গত এবং একান্ত আশার কথা। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যজিৎ-কে অন্ধ অনুসরণ করছে সারা 'ফ্যাশন';—তাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিস্মরণই তাদের একমাত্র প্রাপ্য। এটা আশার কথা নয়; এটা নিদারুণ হতাশার কথা।

একমাত্র হতাশার কারণ এই হলে এই নিবন্ধ সম্পূর্ণ বাহুল্য হতো। একমাত্র হতাশার কারণ এ নয়; এরচেয়ে গুরুতর আশঙ্কার কথা আছে স্বয়ং সত্যজিৎ-চিত্র সম্পর্কেই। এবং সেই সম্পর্কেই এখন বলি।

দুই

চাণক্য পণ্ডিত বলে গেছেন অনেককাল আগেই যে রাজার পূজা কেবল স্বদেশে; বিদ্বানের আদর দেশে-বিদেশে। পুরানো চালের মতো ভাতে বাড়ছে না আর পণ্ডিতের এই সুপ্রাচীন বচন। অন্তত চিত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যাঁরা জ্ঞানী এবং গুণী তাঁরা বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি পেলেও দেশে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ খাতির পাচ্ছেন। বিদেশে অতিরিক্ত মর্যাদার অধিকারই স্বদেশে সম্বর্ধনার পাত্রের দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত অবস্থা। কেন? এই 'কেন'-র উত্তর অনুসন্ধান করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। এই 'কেন'-র সন্তোষজনক জবাব না পেলে আমরা যারা চলচ্চিত্রে নতুন যুগ এসেছে বলে ঊর্ধ্বাহু হয়েছি গর্বে,—অচিরেই দেখব তা নতুন যুগ নয়; নতুন হুজুগ মাত্র। বড়য়াকাফ সার্ট, চোখে গগল্স্ অথবা চশমার একটা ডাঁটি বুকপকেটের বাইরে বার করে রাখার মতোই কিছুদিন চলে তারপর আর চলবে না।

এই 'কেন'-র জবাব খোঁজবার আগে আরেকবার সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাবার প্রয়োজন অনুভব করি যা তা হচ্ছে এই যে চলচ্চিত্রের মতো বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ বস্তু আমাদের অনুসন্ধানের লক্ষ্য না হয়ে ছাপা বই অথবা আঁকা ছবির সোত্র এর উপলক্ষ্য হলে কেন

বিদেশে তা সমাদৃত এবং স্বদেশে অবহেলিত সে প্রশ্ন নিয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হলে চলত অথবা কিছুমাত্র এসে যেত না আমরা বিচলিত হলে অথবা অবিচলিত থাকলে। বড় জোর, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না,—এই প্রবাদের মধ্যেই প্রতিবাদের এলাকা সীমাবদ্ধ থাকতো। থাকতো যে, তার কারণ বই বিক্রী না হলে, ছবি অবিক্রীত থাকলেও কখনও কখনও কারুর কারুর বেলায় পেটের দায়ে লেখা অথবা রেখাকে বিকৃত না করলেও চলেছে, এখনও চলে; ভবিষ্যতেও চলবে। তার প্রস্তুতি-পর্বের ব্যয় চলচ্চিত্র প্রস্তুতির ব্যয়ের তুলনায় এত হাস্যকর রকমের অল্প যে কোনও বীক্ষণযন্ত্রের বেলাতেই তা ধারণার মধ্যে আনা অসম্ভব। সত্যজিৎ রায়,—যিনি বর্তমানে বিশ্বের অদ্বিতীয় চলচ্চিত্রকার,—তাঁর চিত্রও, পক্ষান্তরে, বিদেশের বাজারে বাহবা এবং স্বদেশের লোকদের কাছে আংশিক এবং স্ত্রীলোকদের কাছে সর্বাংশিক উপেক্ষিত হলে, সেই স্বয়ং সত্যজিৎ-ও জিতবার বদলে হারবেন; এবং আমরা তাঁকে হারাবো। সত্যমেব জয়তে,—সরকারী মোহরেই যা আজ জ্বলজ্বল করে কেবল মাত্র; আর কোথাও যা তেমন উজ্জ্বল নয়; যথেষ্ট মোহরের অভাবে,—চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যা সত্য হতে চলেছিল প্রায়, সত্যজিতের হারের [ভগবান না করুন] সঙ্গে সঙ্গেই তা মিথ্যে প্রমাণ হবে; হবারই কথা অবশ্য আজকের জগতে; যে জগতে সত্যের মতো মিথ্যা এবং মিথ্যার মতো সত্য আর কিছু নেই!

তিন

সত্যজিতের ছবি বিদেশে সমাদৃত হবার কারণ কেউ কেউ বলেছেন শিল্পের বা গুণের অকারণ; অর্থাৎ শিল্প বা গুণ গত কারণে এই পুরস্কার নয়,—এই কথাই বলতে চেয়েছেন অথবা চাইছেন কেউ কেউ। তাঁদের বিচারে, সত্যজিৎ পথের পাঁচালী, অপরাজিত অথবা দেবী মারফৎ ভারতবর্ষের আর্থিক এবং পারমার্থিক দারিদ্র্য দেখাবার অগৌরবেই এই গৌরবের নিঃসংশয় অধিকারী। কথাটা ঠিক নয়। নোবেল প্রাইজ কখনও কখনও রাজনৈতিক কারণে দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বই মাত্রেই পায়নি বিশ্বজনের অভিনন্দন। সত্যজিতের ছবি কেবল 'স্বর্ণসিংহ' জয় করলে একথা বলা চলত কিনা জানি না; কিন্তু যখন জানি যে বিশ্বের যাঁরা জ্ঞানী এবং গুণী তাঁদের মনের সিংহাসনেও বসতে পেয়েছে অপরাজিত, তখন তাকে কেবল রাজনৈতিক কারণে বলতে পারি না; নৈতিক কারণেও সে যে বিশ্বের অপরাজিত চিত্র, একথা বলতে বাঙালীর, সত্যজিৎ বাঙালী বলেই, আটকাচ্ছে; যেমন ভেবেছিলো এই বাঙালীই কেবল তার ভ্রষ্টবুদ্ধির কল্যাণে যে রবীন্দ্রনাথ প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র বলে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। আজও সে ভাবতে পারছে কি না বলা শক্ত, সে নোবেল প্রাইজ পেলে যিনি বড় এবং নোবেল প্রাইজ না পেলে যিনি আরও বড়, জগতের সর্বকালের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী কবির নামই, রবীন্দ্রনাথ। একথা ভাবতে সময় লেগেছে; সত্যজিৎ যে প্রাইজ পেলেও বর্তমান বিশ্বের বিস্ময়কর চলচ্চিত্রকার, —না পেয়েও তাই,—একথা ভাবতেও সময় লাগবে।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখে আমরা উপহাস এবং ফরাসীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। আমরা বলেছি রবীন্দ্রনাথ যেহেতু নামকরা কবি সেই হেতু তাঁর ছবিও লোকে না বুঝেই নাম করবে, এই আশায়, ওই তামাশায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আর ফরাসীরা বলেছে, আমরা যে ছবি আঁকবার স্বপ্ন দেখছি অনেককাল ধরে, —সেই আগামীকালের ছবি বেরুলো তোমার হাত দিয়ে। কি করে এ সম্ভব হলো ভেবে বিস্ময় প্রকাশ করেছে বর্তমান জগতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছবির জগৎ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার উত্তর খুঁজে পাননি। আমরা আজও জানি না সে রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি নন; তিনি শিল্পী। তাঁর কবিতায় ছবি এবং ছবিতে কবিতার গঙ্গাযমুনার সঙ্গম বিশ্বপ্রকৃতিতেও বিরল।

সত্যজিতের চলচ্চিত্রেও ওরা সেই একই অসম্ভবের প্রকাশ দেখেই বিস্ময় প্রকাশ করেছে। আগামীকালের যে চিত্ররীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে ইতালীতে, জাপানে, ফ্রান্সে,—সত্যজিতের একালের ছবিতেই সেই আগামীকাল সবচেয়ে বেশী উপস্থিত। নতুন চিত্রভাষার গবেষকরা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অনগ্রসর ভারতবর্ষের একজন লোক কি করে এমন বিচিত্র ভাষার সন্ধান পেলো তাই ভেবেই বাড়িয়ে দিয়েছে অভিনন্দনের পর। এবং এই যে 'আগামীকাল' ব্যাপারটা এরই মধ্যে আত্মগোপন করে আছে একালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর সত্যজিতের সাফল্য ও ব্যর্থতার সমস্ত সিক্রেট।

সেকালের ছবি তিনি একালের পর্দায় উপস্থিত করার কৃতিত্বে বিশ্বের অপরাজিত চিত্রপরিচালক, সেই আগামীকালের দর্শক তাঁর স্বদেশে প্রায় অনুপস্থিত বলেই এদেশে তিনি অনাদৃত।

আমি এর আগে বলেছি যে বিপুল ব্যয়বাহুল্যের কারণে সত্যজিতের পক্ষেও শক্ত হবে জিৎ অথবা জিদ-বজায় রাখা যদি সেদেশের চলচ্চিত্র সেদেশে না চলে। এখন সেকথা প্রত্যাহার না করেই বলছি সত্যজিৎ যদি তাঁর জিদ বজায় রাখেন তবেই জিৎ হবে তাঁর; নচেৎ কিছুতেই নয়। একালের পর্দায় আগামীকালের চিত্র তুলে ধরাই তাঁর ধর্ম। স্বধর্মে নিধন যাঁর প্রতিভা তিনিই শিল্পী। স্বধর্ম ত্যাগ করে, বাজারসকল ছবি করতে যাওয়ার উপদেশ তাঁকে যদি কেউ দেয় তাহলেও সত্যজিৎ যেন মনে রাখেন যে তা তাঁর পরধর্মে। এবং অতএব ভয়াবহ। তাছাড়া যিনি সত্যজিৎ নন তিনি যেমন সত্যজিতের মতো ছবি করব বললেই করতে পারেন না তেমনই সত্যজিৎ যা নন সত্যজিৎ তা হতে গেলেই তা হতে পারবেন না; কিছুতেই না। দাঁড়কাক ময়ূর সাজতে গেলে যা হয়, ময়ূরের দাঁড়কাক সাজতে গেলে তার চেয়ে সাজা যে অনেক বেশি হয়।

শিল্পের সকল কুরুক্ষেত্রেই, সঙ্গীত, চিত্র, সাহিত্য, নৃত্য, ভাস্কর্য,—সকল ক্ষেত্রেই এমন দু'চারজন আসেন যাঁরা বাজারের মুখ চেয়ে সৃষ্টি করেন না। তাঁরাই 'প্রতিভা'। আর সবাই ট্যালেণ্ট। 'প্রতিভা'-কে যা সাজে, —ট্যালেণ্টের তা লাঠিবাজে দস্তয়ভস্কি যখন দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ লেখেন, আর বিথোভেন যখন রচনা করেন নাইন সিমফোনিস [বিশেষ করে, 'ইরোয়কা', 'পাসতোরাল' এবং 'কোর‍্যাল', যথাক্রমে তৃতীয়, পঞ্চম-ষষ্ঠ এবং সপ্তম ও নবম সিমফোনী] তখন তাঁরা সৃষ্টির মুখ চেয়ে ছাড়া আর কারুর মুখে তাকান কি? সত্যজিৎ যখন জলসাঘর, অপুর সংসার বা দেবী তৈরী করেন তখন কি ভেবে করেন, জানি না; সত্যিই জানি না। কিন্তু এ জানি সে যখন অপরাজিত ছবি করেন তখন কিছু ভেবে করেন না। কারণ ভেবেচিন্তে ক্ষুধিত পাষাণ করা যায়; ভেবেচিন্তে 'অপরাজিত'-সৃষ্টি অসম্ভব। সত্যজিৎকে তাই কখনও ব্যবসায়িক উপদেশ দিলে, সে এ্যাডভাইস ভাইস এ্যাড করবে মাত্র; আর কিছুই করবে না। করবে না কারণ শিল্পী যার ওপর দাঁড়ায় তা রীতি নয়; নীতি। অর্থনীতি বলে ডিমাণ্ড অনুযায়ী সাপ্লাই করো; অর্থ হবে। শিল্পের তাতে অনর্থ হবে,—বলে নীতি; সেই বসে; সাপ্লাই করো, ডিমাণ্ড সৃষ্টি হবে। সত্যজিৎ যখন অপুর সংসার করেন তখন বুঝি অর্থনীতি; সত্যজিৎ যখন অপরাজিত করেন তখন, নীতি। সেই অপরাজিত-স্রষ্টা সত্যজিৎকে বলি তিনি অর্থে পরাজিত হোন যত ততই নীতিতে থাকুন অপরাজিত; তাঁর অপরাজিত-সাধনাকে বারম্বার নমস্কার!

আগামীকালকে একালে উপস্থিত করা এবং তাকে স্বাগত জানাবার মতো যথেষ্ট দর্শকের অভাব উপস্থিত মুহূর্তে,—এই হচ্ছে বিদেশে অভিনন্দিত এবং স্বদেশে 'সত্য'-চিত্রের অতিনিন্দিত হবার অদ্বিতীয় কারণ আমার কাছে। তার দ্বিতীয় কারণ সত্যজিতের ছবিতে পাওয়া যাবে না; পাওয়া যাবে ক্ষুধিত পাষাণের ঐতিহাসিক সাফল্যের মধ্যে। এখন সেকথাতেই আসা যাক; অতঃপর সেই ক্ষুধিত প্যাসান-পর্বে।

চার

যে 'আগামীকাল'-কে একালের পর্দায় উপস্থিত করার কারণে সত্যজিতের ছবিতে দর্শকের অনুপস্থিতি উদ্বেগজনক; 'ক্ষুধিত পাষাণে'র বেলায় একালের পর্দায়ও বিগতকালের 'স্থূল' বিস্মৃত না হবার ফলেই বক্সঅফিসে এসব হুলস্থূল কাণ্ড ঘটাতে পেরেছেন এই ছবির বুদ্ধিমান পরিচালক। এবং এর পরিচালকের এই বুদ্ধি এমনিতে হয়নি; অর্জিত হয়েছে অভিজ্ঞতার তিক্ত অশ্রুজলে। অনেক কাল আগে, সম্ভবতঃ সত্যজিৎ ছবির পর্দায় প্রতিফলিত হবারও আগে,—ক্ষুধিত পাষাণের পরিচালক একটি ছবি করেন যার নাম 'অঙ্কুশ'। বিদেশে না হলেও এদেশের অসাধারণ মুষ্টিমেয় দর্শকের মনে হয়েছিল সেদিন যে এছবি সাধারণ ছবি নয়। কিন্তু সাধারণ দর্শকের এছবি অসাধারণ খারাপ লাগায় 'অঙ্কুশ' চলেনি সেদিন। সেদিন থেকেই অঙ্কুশাহত পরিচালক ঠেকে ওই এক ছবি থেকেই অনেক কিছু জেনেছেন।

তিনি জেনেছেন যে সত্যজিৎ-চিত্র বলতে এদেশে কেউ কেউ যখন জ্ঞানহারা ঠিক তখনই 'মায়ামৃগ' দেখতে আবার সেই দেশই মুক্তকচ্ছ [সত্য! সেলুকাস কি বিচিত্র

এই দেশ [সাপ্তাহিক নয়!—আলেকজান্ডার]। অতএব যারা সাধারণ নয় তারা অসাধারণ ছবি বললেই ছবি চলবে না, আবার যারা অসাধারণ নয় সেই সব দর্শকের অসাধারণ ভালো লাগলেও—বক্সঅফিস হবে কিন্তু প্রেস্টিজ হবে না। একই সঙ্গে প্রেস্টিজ এবং 'পাস'-এ্যাট ইজ হতে হলে চাই কিউরিয়াস এম্যালগাম। একই সঙ্গে একাল এবং বিগতকালের রুচির শুভদৃষ্টি ঘটা চাই প্রেক্ষাগৃহের চিত্রবাসরে।

সেই কথা মনে রেখেই তাঁর এই নতুন লাইনে হাতেখড়ি কাবুলীওয়ালার; এবং দ্বিতীয়বার, আসলে বক্সঅফিস সাফল্যের ইতিহাসে অদ্বিতীয় রবীন্দ্রচিত্র 'ক্ষুধিত পাষাণে' সর্বার্থসার্থক বোধহয়।

নাচেতে তোমার
দেখেছি চলা—
চলার মধ্যে
নাচ!

ফিংয়ের ন্যাজের
নাচন চোখেতে—
মানুষ নয় তো
মাছ!

উর্বশী নও
ইন্দ্রানী তুমি!
পায়েতে
তোমার বাজে ঝুমঝুমি!
—চলার মধ্যে
নাচ!

ফিংয়ের ন্যাজের
নাচন চোখেতে—
মানুষ নয়তো
মাছ!

নাচনির নাচ

সাম্প্রতিক কালের চলচ্চিত্র

পার্থপ্রতিম চৌধুরী

বহু মাসিক পত্রের নিয়মিত লেখক। নাট্যকার হিসাবে ছাত্র মহলে অধিক পরিচিত। বহু চলচ্চিত্রের সহকারী পরিচালক। চলচ্চিত্রে অভিনয়েও দক্ষতার সঙ্গে উত্তীর্ণ। এই প্রতিভাবান তরুণ লেখকের ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বাঙলা ছবি আঁতুড় ঘর আর অন্নপ্রাশনের বছরগুলো পেরিয়ে এসেছে অনেকদিন, এখন তার অভিনব যৌবনের মিঠেকড়া রোদ্দুরটি একটা ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গীর ছাদ বেয়ে উৎসাহীদের উঠোনে এসে পড়েছে। আর সেই-জন্যেই জৌলুষটুকু চিরস্থায়ী করার এষণায় এখন তার দেহমনের করণ প্রকরণ নিয়ে নানান্ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। আসলে এই সময়টাই হচ্ছে সত্যিকারের দুর্ভা-বনার সময়; ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যসুষমা চিহ্নিত করার, আগত অঙ্কুরকে স্বাগত স্মরণীয় করার এমন মাহেন্দ্র-ক্ষণটি হেলায় হারালে উত্তরকালের কাছে জবাব দেবার কিছুই থাকেনা। ভরসার কথা, আমরা এ সম্বন্ধে ইদানীং সচেতন হয়েছি। আর তাই সাম্প্রতিক কালের চলচ্চিত্র নির্মাণের যোজনের আয়োজনটি এমন মানবিক হয়ে উঠেছে। আরও লক্ষণীয়, আমাদের সৃষ্টির রংমশালে বর্তমান যুগের মালমশলাটির একটা অনন্যমিশ্রণও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এলিয়ট যে কথা বলেছেন—"There is for each time, for every artist a kind of alloy which makes the metal workable into art." এবার তারই প্রমাণ হয়তো পেতে বসেছি আমরা এ-দেশের ছবিতে। এটা শুভ সন্দেহ নেই, কারণ যুগকে বাদ দিলে যুগোত্তর হওয়া চলেনা, চেতনাকে অস্বীকার করলে ভগ্নাংশ নিয়ে পুতুলখেলা চলতে পারে কিন্তু সমগ্র শিল্পায়ন অসম্ভব। পট ভালোবাসি, ভূমিকা পছন্দ করি এই অজুহাতে পটভূমিকাটা তলিয়ে না দেখলে সৃষ্টিপর্বের প্রচ্ছদটা ঠিক শোভন সংস্করণ হবে না; বর্তমানকালের কীর্তিমান প্রতিভাদের মধ্যে এ সচেতনতা এসেছে বলেই ছবি দেখতে বসে মনে হচ্ছে, ছবিই শুধু দেখলাম না—সঙ্গে সঙ্গে পেলাম আজকের যুগের শানাই আর রোশ্‌নাই এর আমেজটুকু। আর সবচেয়ে আশার কথা এইসব যুগোপযোগী শিল্পসৃষ্টি বাঁচবে, চিরদিন বেঁচে থাকবে বলে। বাস্তব কথাটা আপেক্ষিক হলেও বাস্তবের স্তব না করে, বাস্তবটা যে আমাদের বাস্তু তা ভুললে চলবেনা। প্রসঙ্গতঃ অ্যালেক-জ্যাণ্ডার নক্‌স্ এর কটি সুন্দর কথা মনে পড়ছে—"It's an interpretative art and is dead the year after next; it is dead because the manners of the people have changed. It's dead but that doesn't mean it has never been alive." তাই আজকের দিনের ছায়াছবির আপাতমৃত্যু হয়তো ঘটবে দুশো পাঁচশো বছর পরে—কিন্তু স্মর্তব্য হয়ে থাকবে তারা এইজন্যেই যে 'পথের পাঁচালী' থেকে 'অপুর সংসার' কিংবা 'কাবুলীওয়ালা' থেকে 'ক্ষুধিত পাষাণ' অথবা 'চলাচল' থেকে 'অযান্ত্রিক' এর মধ্যে কতগুলো জীবন্ত জীবনের কবোষ্ণ নাড়ী আর নির্ণয়ের উত্তাপটুকু বর্তমান ছিল। পরিমিত কালজ্ঞানের সঙ্গে সূক্ষ্ম রসরুচি বোধের দুর্লভসমন্বয় না ঘটলে আর্টের কোনো দরবারেই শরসন্ধানের সাফল্য আর সুরসন্ধানের বৈচিত্র্য আসে না, আসতে পারে না।

ছায়াছবি নির্মাণের ইতিহাসে এ বছরটা আর একদিক দিয়ে এইজন্যেই লক্ষণীয় যে এই বছর থেকে সৃষ্টি-কর্তা যাঁরা, মানে সেইসব পরীক্ষিত প্রতিভার দলে বেশ একটা আন্তরিক সচেতন সুস্থ প্রতিযোগিতা চলেছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশী লাভ হচ্ছে দর্শকদের। দর্শকরা ক্রমশঃ আরোও অভিজ্ঞ আরোও পরিপক্ক কুশলতার কৌলিন্যের মধ্য দিয়ে আসল কুশীলবদের আবিষ্কার করে নিতে পারছে। প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি উল্লেখ্য চলচ্ছবির আলোচনা করছি।

চোখ খুলে দেওয়ার কৃতিত্বে আর নতুন পথদ্রষ্টা হিসেবে প্রথমেই মনে পড়ে সর্বজয়ী সত্যজিত রায়ের নাম। তাঁর সাম্প্রতিক সৃষ্টি 'দেবী'—স্মরণীয় নিশ্চয়ই তবুও সুস্থ সমালোচনার দাবী রাখে। আমার ব্যক্তিগত মতে 'দেবী'র মধ্যে সিনেম্যাটিক গুণগুলো বজায় রাখার দিকে যতটা নজর রাখা হয়েছে ততটা অন্যদিকে নয়। মূল গল্পের প্রধান দ্বন্দ্ব দেবী আর মানবী নিয়ে—সেই সবচেয়ে মানবিক দিকটাই যেন মনের কাছে সাড়া দিতে পারেনি। সত্যজিতবাবুর বিশ্লেষণের দিকটা চরিত্রগত না হয়ে অধিকাংশ সময়েই পরিবেশের ওপর বিন্যস্ত ছিল। আর সেইজন্যেই জলসাঘরের জমিদারের মতো এখানেও শেষের দিকে কালীকিঙ্করকে মেলো-ড্রামার সাহায্য না নিয়ে চরিত্রটির নিজস্ব অন্তঃপ্রবাহের জ্বালাটুকু ফুটিয়ে তুলতে দেখা যায়নি। দয়াময়ী চরিত্রের স্নিগ্ধতাটুকু রাজনীগন্ধার মতোই ছবির প্রথমপর্বে শিল্পিত হয়েছে—কিন্তু দ্বন্দ্বপ্রধান অংশে সেই রজনীগন্ধার ক্রমশঃ শুকিয়ে যাওয়ার বেদনাটুকু রসচিহ্নিত হয়নি বলেই আক্ষেপ। এটুকু বাদ দিলে ট্রিট্‌মেণ্টের দিক দিয়ে বহু জায়গাই প্রশংসনীয়—বিশেষকরে ছবির টাইটেল ও প্রথমদিকে দেবী বিসর্জন অধ্যায়, খোকার আসা ও যাওয়া, স্বামীর সঙ্গে দয়াময়ীর পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার দৃশ্যটুকু, ফুলের মধ্য দিয়ে উন্মাদ দয়াময়ীর অন্তর্ধানের দৃশ্য—এ সবের মধ্যে আর্টের রসরূপের সংযত সংস্কারটি অপূর্ব। দয়াময়ী চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুরের অন্তর্স্পর্শী অভিনয় গার্বোর মতই তাঁর বিস্ময়কর একাকীত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর একটা কথা দয়াময়ীকে উন্মাদ না করে কি গল্পের শেষ করা চলতো না? মূলগল্পের শেষটুকু অনুসরণ করলে (অর্থাৎ গলায় দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যার ব্যাপারটা) যদি শিল্পের রসহানি ঘটতে পারতো তবে উন্মাদ দয়াময়ীকে নিয়ে নাটকের শেষ অঙ্ক জমিয়ে ইতি করার মধ্যে এমন কিছু রসবৃদ্ধি হয়েছে বলেতো আমার মনে হয় না। আর দয়াময়ীর হঠাৎ মৃত্যুটাও যেন কপট কল্পনা বলে মনে দাগ কাটে না। অন্যান্য যান্ত্রিকাদিক সত্যজিতবাবুর সবছবিতেই দর্শনীয় (কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দগ্রহণ ছাড়া), এ ছবিতেও তার ব্যতিক্রম পাইনি।

'অযান্ত্রিক' প্রতিভা যান্ত্রিকতায় যে কতটা পাকা সে প্রমাণ পেয়েছি তার 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে। চলচ্চিত্র হিসেবে 'মেঘে ঢাকা তারা' চালচ্চিত্রটি এমন নিষ্ঠা আর দরদ দিয়ে আঁকা যে তা যে কোন শিল্পসচেতন মানুষের মনের অন্দরমহলে স্থায়ী আসন দাবী করতে পারে। তার সবচেয়ে বড় কারণ মানচিত্র আঁকতে গিয়ে

ঋত্বিকবাবু মনচিত্রের ওপর কোথাও অবহেলা করেননি বরং মানবিক সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক প্রসাধনের এক মহান সম্মেলন দৃষ্টব্য করেছেন। শক্তিপদ রাজগুরুর গল্প অত্যন্ত সাধারণ; তবে এ গল্পের মহৎ দিকটা হচ্ছে এর চেতনগত আন্তরিকতাটুকু। জীবনের শ্লেটে আঁককষার বিভিন্ন স্তরপর্যায় থেকে বেশ কয়েকটা সিঁড়িভাঙ্গা যেন তুলে ধরেছেন লেখক; আর চিত্রনাট্যকার পরিচালক ঋত্বিকবাবুও জীবন ও তার যন্ত্রণার সেই সমাসসৌরভটুকু আত্মরসে আত্মীয় করে তুলেছেন। মৃণাল সেনের 'বাইশে শ্রাবণে' বাস্তবের যুগঘনিষ্ঠ রূপানুশীলন হতে দেখেছি—কিন্তু সেখানে একটা উগ্রতা, তীব্রতা আর রুক্ষতার ঝাঁঝটুকু বহুলাংশে অভিজ্ঞ হলেও মনোজ্ঞ হয়নি। এ ছবিতে ঋত্বিকবাবুর কৃতিত্ব এইখানেই—তিনি ধূলিরুক্ষ নৈমিত্তিক চেতনার তিক্ততার মধ্যেও একটা অনলস লাবণ্যে অনন্য করেছেন; আর এইখানেই তিনি আকৃতিক পটে প্রাকৃতিক হতে পেরেছেন। কম্পোজিসন আর কোরিওগ্রাফি এ ছবির আর এক ঐশ্বর্য। কম্পোজিসনে প্রায় সারাক্ষণই একটা ফ্লুইডিটি ছিল—যা দ্যোতনা ও রসের দিকটা বিশেষভাবে শিল্পীত করতে পেরেছে। পরিকল্পনার দিক থেকেও কতকগুলি দৃশ্য সাম্প্রতিক কালের চলচ্চিত্র সৃষ্টির ইতিহাসে একেশ্বর অধ্যায় হয়ে থাকবে—প্রসঙ্গতঃ যেমন—সনতের প্রেমপত্র পড়ার দৃশ্যে যেখানে দাদা এসে বোনের সঙ্গে দুষ্টুমি করছে এবং পরে ওই একইভাবে উপস্থাপিত দৃশ্যরসের মধ্য দিয়ে দাদা আবিষ্কার করছে বোনের রোগাক্রান্ত অসহায় একটা চূড়ান্ত পর্যায়।

এ ছবির অভিনয়ের দিকটাও স্মরণীয়—নীতার চরিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী, দাদার চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক পিতার চরিত্রে বিজন ভট্টাচার্য ও মায়ের চরিত্রে গীতা দে। সংসারের পোড় খাওয়া রোদ্দুরের চারটি মিঠেকড়া মানুষকে অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আবহসঙ্গীতে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এমন একটা সিনেম্যাটিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন, যা বর্তমান কালের চিত্রজগতে বিরল দৃষ্ট। তবে ছবির শেষ দৃশ্যে নীতার মুখে "আমি বাঁচাতে চাই" এই আত্মআর্তের বেদনাঘন রূপটি পুনরাবৃত্তির ফলে রসহানি ঘটিয়েছে। ইতালীয় স্কুলের বিশেষ করে নিওরিয়ালিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর মানস প্রাকাম্য সত্যজিত রায় আর ঋত্বিক ঘটকের নিজস্ব নিজস্বতার মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে অনুশীলিত। তাই ইতালীয় স্কুলের যেটুকু প্রসাদগুণ, অর্থাৎ ছন্দমধুর কাব্যিক অতীন্দ্রিয়তার মধ্যে মানবিকতার রসসম্মিলন তা একান্তভাবে উপস্থিত এঁদের সৃষ্টিতে—কিন্তু নিওরিয়ালিজম বা ইতালীয় স্কুলের যা দোষ, অর্থাৎ অডিও ভিসুয়াল তথা শ্রবণ দর্শনের মহেন্দ্র মিলন দিকের ভারসাম্যের মধ্যে একটা প্রকট তারতম্য—তা এদের ছবিতেও পরিলক্ষিত। অর্থাৎ দৃশ্যবিশেষে শুধু দর্শনের আনন্দটুকুই থাকে—সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতির লাবণ্য থাকে না, আবার কোনো কোনো জায়গায় শ্রুতির রসপর্বে দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতটা ঠিক মেজাজমাফিক হয় না। এইজন্যেই আবহসঙ্গীত চাবুকের আওয়াজ সহ effect music-এর পুনরাবৃত্তি 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবির অনেক জায়গায় রুক্ষ চমকের সৃষ্টি করেছে মাত্র। দর্শন শ্রবণের ভার সমন্বয়ের অভাবে অডিও ভিসুয়াল আর্টের শিল্প সোপান সিনেমা, তাই ঐ দুয়ের ভারসাম্য বজায় রেখে রস বিশ্লেষণ করা মহৎসৃষ্টির গোড়ার কথা। যাক্ সে কথা, তবু 'মেঘে ঢাকা তারার' মধ্যে ঋত্বিক প্রতিভার একটা ঋষি উন্মেষ হয়েছে; যাকে বাংলা ছবির পুষ্টির ইতিহাসে উপেক্ষা করা যায় না।

স্বাভাবিক স্বাস্থ্য স্ফূর্তির মধ্যে আজকের দিনে অনেকেই আছেন যাঁরা স্টাণ্ট-এর সাহায্য নিয়ে গিরি লঙ্ঘন করার চেষ্টা করে থাকেন, এতে তাঁদের সে চেষ্টা তো ব্যর্থ হয়ই পরন্তু তাদের প্রতিভার পঙ্গুত্বটাও প্রকট হয়ে ওঠে। তেমনি এক ধরণের স্টাট ছিল মৃণাল সেনের প্রথম ছবি 'নীল আকাশের নীচে'তে—যদিও তা বিশেষভাবেই কাহিনীগত চমকের পর্যায়ে পড়ে। এক চীনে ফেরিওয়ালার ব্যক্তিগত জীবনের সহৃদয় হৃদয় সংবাদকে বিচিত্রিত করা ছিল এ ছবির উদ্দেশ্য—বিদেশী মানুষ, বিদেশী পরিবেশ, বিদেশী পোষাক, বিদেশী প্রকৃতি—যার কোনটার সঙ্গেই আমাদের অভিজ্ঞ ঘনিষ্ঠতা বা পরিচয় নেই তাকে কেন্দ্র করে রেখে অনেকখানি ছেলেমানুষি করে দর্শকদের ধা-ধা লাগাবার সুযোগ অনেকেই হাতছাড়া করতে চান না—মৃণাল সেনও করেন নি। তাই সেখানে সাধারণ মানের একটা পরিচ্ছন্ন চেষ্টা ছাড়া আমরা অন্য কোন

কৃতিত্বই খুঁজে পাই নি (অবশ্য এ দেশের জনপ্রিয় দৈনিক ও অন্যান্য কলা-সমালোচকদের ভাষায় এই ছবিতেই নাকি মৃণালবাবুর কৃতিত্ব মহীরুহ স্পর্শী হয়ে দেখা দিয়েছিল।) মহীরুহ মাফিক বিশেষণের জন্যে অভিধান না ঘেঁটেও বলা চলে মৃণাল সেন সেই সাধারণত্বের সীমারেখা ছাড়াতে পেরেছেন তাঁর সদ্য নির্মিত 'বাইশে শ্রাবণ' ছবিতে। সাধারণ গল্প—সিনেম্যাটিক উঁচু-নীচুর বা নাটকীয় ব্যাসবন্ধনের কেন্দ্র ঘন রূপ বিশেষভাবে অনুপস্থিত ছিল ঐ গল্পে। তবু সেই সাধারণ ব্যঞ্জনার সাহায্য নিয়ে ব্যাপকতার ইঙ্গিত দিতে পেরেছেন বলেই মৃণাল সেন এ ছবিতে মৃত নয়, নিজস্ব ভাবধারার ধারাপাতের সঙ্গে দর্শকচিত্তকে পরিচিত হবার, ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ তিনি দিয়েছেন।

ছবির প্রারম্ভিক অধ্যায়ে কাপড়ের দোকানে কষ্টকল্পিত দৃশ্যগুলি ছাড়া আরোও খানিকটা এগিয়ে নায়কের স্থিতধী আন্তঃসন্ধানের মধ্য দিয়ে ফ্লাস ব্যাকে যাওয়ার পরিকল্পনাটি পরিপক্ক কুশলতার কুণ্ঠিত-স্বরূপ। কাট্ করে ফ্লাসব্যাকে গিয়ে এমন একটা স্বচ্ছন্দ গতির প্রেরণা নিয়ে এ গল্পের স্মৃতিপট উদ্ভাসিত—যাতে নয়নমনের পরিতৃপ্ত পাওনাটুকু হ'ল "A feeling you feel that you are going to feel a feeling, you have never felt before." কিন্তু গ্রামীন বাংলার প্রচ্ছদপট থেকে অন্তর্পটের চিত্ররস বজায় রাখতে গিয়ে অনেক জায়গাতেই মনে হয়েছে 'পথের পাঁচালী' বা 'অপরাজিতের' সেই সেন্স অব ভিসুয়ালাইজেসনটি যেন মৃণাল সেনের মধ্যে বিশেষভাবে সংক্রামিত হয়ে গেছে। সংস্কার থেকে আলাদা হয়ে যে সংস্করণ তাকে বাহবা দেওয়া যায়—কিন্তু অনুকরণের মধ্য দিয়ে (সঠিক অর্থে অনুকরণ নাও হতে পারে, হয়তো মৃণালবাবু এটা এড়াতে পারেন নি) সৃষ্টির ব্যাকরণগত কৌলীন্যটুকু বজায় রাখা গেলেও প্রকরণ গত প্রসাধনটিকে অভিনন্দিত করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, 'বাইশে শ্রাবণে' বাস্তবের স্তব করতে গিয়ে অপ্রয়োজনীয় রুক্ষতা আছে, তিক্ততা আছে কিন্তু কোথাও একটা বাস্তবঘন পুতুল খেলা প্রতিমা আরাধনার পর্যায়ে গিয়ে উন্নত হতে পারে নি। অভিজ্ঞতার প্রমাণ আছে, কিন্তু অভিনিবিষ্ট হওয়ার আনন্দের অভাব রয়েছে। তারপর বিষণ্ণতা বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রতিবারেই আবহসঙ্গীতে জনপ্রিয় সুধাকণ্ঠের আক্ষেপমূলক সুরমূর্চ্ছনা 'ও বন্ধুরে' ইত্যাদিও ভাল লাগেনি। তবে প্রভাত সূর্য বন্দনার মধ্য দিয়ে ছবির প্রাথমিক দৃশ্যগুলি একান্ত শিল্পরস সম্মত—এই জায়গায় পরিচালক পরিবেশ বা মূড্ সৃষ্টিতে দক্ষ কারিগর আর কল্পনা প্রবণ রূপদ্রষ্টার সচেতন মেজাজটি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। অভিনয়ে শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের সংযত নিষ্ঠা যে কোন অভিনেতারই শিখে রাখবার মতো। বাই অ্যাক্টিং এর সাহায্য আর ইনট্রোস্পেক্টিভ স্টাইল অফ য়্যাকটিং-এর মাধ্যমে বেছে নিয়ে এ ছবিতে প্রিয়নাথের চরিত্রসৃষ্টি তাঁর শিল্পী-জীবনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি গল্প সম্প্রতি চিত্রায়িত করা হয়েছে—তা হল 'ক্ষুধিত পাষাণ'। ছবিটির ব্যবসাগত অভাবিত সাফল্যের ফলে এ ছবির আলোচনাতেও প্রথমেই মতানৈক্যের নীরস পাঁচিলগুলো বাধার মতোই সামনে এসে পড়ছে। তবু স্মরণীয় সৃষ্টি বলেই দুকথা বলার আছে।

'অঙ্কুশ'-এ সর্বপ্রথম যে প্রতিভার অঙ্কুর লক্ষ্য করেছি—'উপহারে' সেই প্রতিভার উন্নত উন্মেষ হয়েছিল। সেই প্রতিভাধর হলেন শ্রীতপন সিংহ; যাঁর অল্পতা অনেক প্রসার বিস্তারের চেয়ে বহুল, যাঁর নিভৃষণতা অনেক অলংকরণের চেয়ে শোভান্বিত। তাঁর প্রয়োগফল সামান্য কিন্তু যোগফল বহুর কারণ সবচেয়ে সরল সোজা পথে গল্পে জমাতে পারেন তিনি। মানুষের মনের স্বরলিপি অনুসারে তপনবাবু সুরযোজনায় দক্ষ বলেই তিনি ভাস্বর। আর তা প্রমাণিত হয়েছেও অনেক বার; নইলে 'ক্ষণিকের অতিথি'র মতো বহুলাংশে দুর্বল ছবি সাধারণ মানুষের বিশেষ করে বাংলা দেশের বৈঠকী-মানুষদের মনকে এমনভাবে ছুঁয়ে যেতে পারতো না। কোনরকম গভীরতা বা ব্যাপকতা, ব্যঞ্জনা অথবা বিন্যাসগুণ তাঁর চিত্রসৃষ্টিতে না—বরং থাকে সেণ্টিমেণ্টের হাল্কা ওড়নাটুকু সহজ হাওয়ায় উড়িয়ে নেবার কায়দাটি। তাই 'অপরাজিত' হয়ে বাংলা ছবির স্বর্ণ ইতিহাসে তিনি না থাকলেও 'ক্ষণিকের অতিথি' হিসেবে তাঁর উপস্থিতির সময়টুকু তিনি বাজীমাৎ করে যাবেন। 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবি তাঁর সবচেয়ে কৃত-কৃতিত্বের-সফল ফসল।

রবীন্দ্র সাহিত্যের এক অনন্যসৃষ্টি এই 'ক্ষুধিত পাষাণে'র সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার লিটারারি ডেপ্‌থ আর ক্ল্যাসিকরসের দিকটা। এ গল্পের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে কল্পনার অজস্র অবগাহন, অন্যদিকে তেমনি ভাবে রয়েছে উত্তাপ, উত্তেজনা আর মানসিক ভাবলোকের একটা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মচর্চ্চনা। এই সবটুকু মিলে 'ক্ষুধিত পাষাণের' সাহিত্য; নির্জনতার নীড়ে ব্যক্তিক চিন্তাদর্শনের দর্পণ মুগ্ধ ছায়াঘন রূপটি। সেখানে ক্রাইম গল্পের মতো আলোছায়ার স্টার্ট (যা ক্যামেরা নামক যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে বেশ দক্ষতার সঙ্গেই উপস্থাপিত করা হয়েছে)। 'মেহের আলী'কে সাধারণ উন্মাদের মতো অপব্যবহার করে দর্শকদের বার বার ভূতুড়ে ধাক্কায় ফেলা—কিংবা নায়ককে ক্ল্যাসব্যাকের মধ্যে এক সেনাপতির চরিত্রে আরোপিত কোরে মূল গল্পাংশের নির্জন কাব্যরসটিকে উপেক্ষা করা—এ সবের মধ্যে তপনসিংহ এমন কিছু অনাস্বাদিত অপূর্বের সন্ধান দিতে পারেন নি।

চলচ্চিত্রায়ণ এ ছবির অনবদ্য সম্পদ। আর এক সম্পদ 'করিম খাঁ'র চরিত্র পরিকল্পনা ও তার প্রয়োগকুশলতায় রাধামোহন ভট্টাচার্যের একক কৃতিত্ব। আর ভাল লেগেছে আলী আকবর খাঁ সাহেবের আবহসঙ্গীত। 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবির প্রতিটি ফ্রেমিং-এর মধ্যে থাকা উচিত এক একটানা ক্ল্যাসিকাল পেন্টিং-এর মতো লাবণ্যমদির পূর্ণতা—হয়তো তার অনেকটাই সিনেমার ক্ষেত্রে অসম্ভব ছিল।

আর কৃতিত্ব দেখা গেছে তপনসিংহের দৃশ্যবিশেষের ট্রিট্‌মেন্টে, আউটডোর লোকেশান্ নির্বাচনের ব্যাপারে। পোস্টমাস্টার পর্বটুকু ও 'করিম খাঁ'র অপূর্ব আসা ও যাওয়ার পরিকল্পনার মধ্যে। এ ছবি নির্মাণের পেছনে তপনসিংহের যে একটা অনলস উদ্যম, অনন্য নিষ্ঠা আর তন্ময় একাগ্রতা সবসময়েই বর্তমান ছিল তা ছবি দেখতে বসলেই অনুভব করা যায়। তাই 'ক্ষুধিত পাষাণ' দেখে তপনসিংহ সম্বন্ধে নতুন করে আশা করার অনেক কিছু আছে।

সাম্প্রতিক কালের বাংলা চলচ্চিত্রে এই তো গেল মুক্তি প্রাপ্ত ছবিগুলোর কথা—এ ছাড়াও কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর চলচ্চিত্র মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে।

তার মধ্যে বিশেষ করে 'অন্তরীক্ষের' অন্তর্দ্রষ্টা শ্রীরাজেন তরফদারের 'গঙ্গা' এক যুগোত্তর সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়।

সাম্প্রতিক ছবির এই উন্নত পর্যায় লক্ষ্য করলে স্বাভাবিক সূত্রেই একটা সম্ভাবনা মনে আসে—'গোল্ডেন লায়ন অব দি সেন্ট মার্ক' ছাড়াও বাংলা ছবির মান কৌলীন্য খুব অল্প দিনের মধ্যেই 'অস্কার' কিংবা 'একাডেমী অ্যাওয়ার্ড' বিজয়ের সম্মান ছিনিয়ে আনতে পারবে।

বাস্তব বুকে চলমান ছায়া মিলায়ে যায়। তবু যে হৃদয় মরিচীকা লাগি ছুটিতে চায়!

মনের আকাশে চিল উড়োনা, উড়োনা—
আমার তুলির রঙ গিয়েছে ফুরায়ে
নিষন্ন মনে মোর ছবি জুড়োনা,
তোমার স্মৃতির রেণু
আজকের অবেলায় যাবে গুঁড়ায়ে।

তুমি উড়েছিলে তাই পরিকীর্ণ ছবি
শিল্পী মোরে করেছিল ঈষৎ ইশারায়।
সন্ধ্যায় আঁকলুম—প্রভাতের ভৈরবী
একান্তে বিশ্বের বিজন পরিধায়।
তবু বলি—চিল আজ উড়োনা, উড়োনা।

সেদিন তো জাদু দিয়ে বানিয়েছি জাদু ঘর।
পথহারা সাহারায় থেমে গেল নদী।
তারি যাতনা বিথারে—তুমি, তুমি আজ পর
তাই বলি উড়োনাকো আর
বিষন্ন আকাশের মৌলি অবধি।
আজ তুমি যত দূরে ছবি গেঁথে হবে যে উধাও
ততখানি দুজনায় হবে ব্যবধি।
তাই বলি—চিল আজ উড়োনা, উড়োনা।

শৈলশেখর মিত্র

বম্বের বিখ্যাত মণিপুরী নৃত্যশিল্পী নয়না জাভেরীর একটি বিশেষ ভঙ্গিমায়— রাধা নর্তন।

খবরাখবর

মণিপুরের উৎসব-অনুষ্ঠানগুলির প্রাণবস্তু এবং ঐ উৎসব-অনুষ্ঠানগুলির স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে 'মণিপুরী নাচে'র বিভিন্ন প্রকরণ রচিত হোয়ে থাকে। যথাযোগ্য গীত-বাদ্যের অনুষঙ্গে পরিবেশিত 'মণিপুরী নাচ' বিশিষ্ট বেশ-ভূষার বর্ণবৈচিত্র্যে আকর্ষণীয় হোয়ে ওঠে। 'মণিপুরী নাচে'র অমিত নাট্য-সম্ভাবনা কুশলী নৃত্য-রচয়িতার রচিত ও নৃত্যনাট্যে নর্তক-নর্তকীর দেহচ্ছন্দের মাধ্যমে মূর্ত হয়।

ভারতীয় নৃত্যশিল্পের অনন্য সম্পদ এই মণিপুরী নাচের অন্যতম অগ্রণী ও যশস্বিনী প্রবক্তা নয়না দেহচ্ছন্দের গীতল মাধুর্যে আকৃষ্ট হোয়ে তিনি ঐ জাভেরী। মণিপুরী নাচের সুললিত ও নয়নরঞ্জক

প্রথম সারি বাঁদিক থেকে : দর্শনা, নয়না, গুরু বিপিন সিন্‌হা, রঞ্জনা ও সুবর্ণা।

মণিপুরী নৃত্যে গুজরাটের জাভেরী পরিবার

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের একটি ছোট দেশ মণিপুর। কাহিনী-কিংবদন্তীর অন্তরালে তার প্রাচীন ইতিহাস হারিয়ে গেলেও শিল্প-ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য তার লুপ্ত হয় নি কখনো। সুপ্রাচীনকাল থেকে মণিপুর বিবিধ শিল্পসম্পদের, বিশেষত নৃত্যকলার জন্য, ভারতের তথা বিশ্বের তাবৎ শিল্পরসিকের বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছে। মণিপুরের আকাশে বাতাসে নাচের ছন্দ, গানের সুর। নৃত্য-গীত-বাদ্য মণিপুরের বাসিন্দাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হোয়ে মিশে আছে।

মণিপুরের নাচ, চলতি কথায় যাকে বলা হয় 'মণিপুরী নাচ', ক্লাসিক-ধর্মী। 'আঙ্গিকাভিনয়' এই নাচের প্রধান বৈশিষ্ট্য, দেহচ্ছন্দের সুললিত ভাষায় এর প্রাণ-স্ফূর্তি। শরীরের কোন বিশেষ একটি অংশের উপর প্রাধান্য না দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গের সুসমঞ্জস ছন্দের মাধুর্যে 'মণিপুরী নাচ'-এর প্রকৃত ভাষা ফোটাতে হয়।

'মণিপুরী নাচ' বহু বিচিত্র প্রকরণের বৈভবে বিশিষ্ট। বিবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পটভূমিকায় এই সব প্রকরণের উৎপত্তি। সাধারণভাবে, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ও বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনী-কিংবদন্তীই

মণিপুরী
নৃত্যভঙ্গিমার
একটি রসঘনদৃশ্যে
জাভেরী ভাঁনন্বয়
সুবর্ণা ও দর্শনা।

শৈলীর নৃত্যকলা শিক্ষা করতে শুরু করেন। শ্রীযুক্ত বিপিন সিন্‌হা তাঁর নৃত্য-গুরু হতে সম্মত হন। শ্রীযুক্ত সিন্‌হার বৈদগ্ধ্য ও কবিদৃষ্টির, এককথায় তাঁর সৃষ্টিশীল শিক্ষণ শৈলীর, স্পর্শ পেয়ে নয়নার শিল্পী-প্রতিভা ধীরে ধীরে পত্র-পুষ্প-পল্লবের ঐশ্বর্যে বিকশিত হোয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের অগ্রণী নৃত্যশিল্পীদের অন্যতম নয়না তাঁর চরিত্রসুলভ বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেন, তাঁর সমস্ত সুনাম ও খ্যাতির মূলে আছেন তাঁর গুরু বিপিন সিন্‌হা; গুরুর অবিরল প্রেরণা ও উৎসাহ-ই তাঁর সকল শিল্পকৃতি ও যশ-কৃতিত্বের উৎস-স্থল।

'মণিপুরী নাচে'র আঙ্গিক-নিয়ম-পদ্ধতি ও যথার্থ প্রাণধর্মের উদ্ঘাটনেও নয়না বিশেষভাবে সচেষ্ট এবং এ-ব্যাপারে তিনি তাঁর গুরুর যোগ্য সহকর্মী। বোম্বাই-এর বিভিন্ন নৃত্য-শিক্ষালয়ে তিনি গুরুকে শিক্ষণ-কার্যে সহায়তা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মণিপুরী নাচের প্রচার-প্রসারে নয়নার দান অনস্বীকার্য। নিয়মিতভাবে নৃত্য-সহযোগে বক্তৃতা, আবৃত্তি ও নৃত্যনাট্যের এবং পত্র-পত্রিকায় স্বরচিত প্রবন্ধাদি ও বেতার-কথিকা ইত্যাদির সাহায্যে তিনি তাঁর প্রিয় নৃত্যশৈলীকে জন-প্রিয় কোরে তোলার চেষ্টা করেছেন। 'মণিপুরী নাচ' আজ ভারতের প্রধান চারিটি ধ্রুপদী নৃত্যশৈলীর অন্যতমরূপে স্বীকৃত এবং সেই স্বীকৃতিলাভের পেছনে নয়নার দান উপেক্ষণীয় নয়।

ঐতিহ্যাশ্রয়ী 'মণিপুরী নাচে' বিশেষ পারঙ্গম হলেও নয়না নৃত্য-রচনার ব্যাপারে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন। তাঁর মতে, ধ্রুপদী নৃত্যকলার ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য অবিকৃত রেখে তাকে আধুনিক রঙ্গমঞ্চের ও নাট্যশিল্পের উপযোগী কোরে তোলাই নৃত্য-রচয়িতা-শিল্পীর অন্বিষ্ট হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, ঐতিহ্যের অর্থ নিছক পুরাতনের পুনরা-বৃত্তি নয়, আধুনিক জীবনের সৃষ্টিশীল ভাষা ও ভঙ্গীতে ঐতিহ্যের নতুন ব্যাখ্যানই শিল্পস্রষ্টার কর্তব্য হওয়া উচিত।

নৃত্যশিল্প নয়নার ফ্যাশান বা আত্মপ্রচারের মাধ্যম নয়, তাঁর আত্মিক প্রয়োজন। অন্তরের নিগূঢ় প্রেরণায় তিনি নৃত্যকে তাঁর জীবনধর্ম বোলে গ্রহণ করেছেন। সেই জীবনধর্মের স্বরূপ আরো গভীরভাবে বোঝার জন্য তিনি একাধিকবার সুদূর মণিপুরে গেছেন, 'মণি-পুরী নাচে'র চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ কোরে এসেছেন যথার্থ শিল্পীসুলভ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায়।

নয়না একাই শুধু নন; তাঁর তিন বোন—রঞ্জনা, সুবর্ণা ও দর্শনা—তাঁরাও জ্যেষ্ঠার পদাঙ্ক অনুসরণ কোরে নৃত্যকে আত্মপ্রকাশের বা আত্মবিকাশের মাধ্যম-রূপে গ্রহণ করেছেন এবং 'মণিপুরী নাচে'র প্রাণ-স্ফূর্তিতে ও প্রচারে-প্রসারে সর্বদাই অগ্রজকে সাহায্য কোরে থাকেন। নয়না, রঞ্জনা, সুবর্ণা ও দর্শনা—এই 'জাভেরী ভগ্নীচতুষ্টয়' 'মণিপুরী নৃত্যকলা'র সার্থক-সফল প্রবক্তারূপে সকল নৃত্য-প্রতিষ্ঠান ও নৃত্য-সংস্থার সপ্রশংস স্বীকৃতি পেয়েছেন। আর সেই সঙ্গে পেয়েছেন শিল্পরসিক জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমাদর ও অভিনন্দন, শিল্পীমাত্রেরই যা আন্তরিক কাম্য।

—প্রভাত গুহরায়।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বার্মাশেলের দান

পেট্রোল ও কেরোসিন তৈল ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে বার্মাশেলের নাম আজ ভারতের ঘরে ঘরে সুপরিচিত। অধুনা জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠার পর ভারতের সামন্ততন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রাজা, জমিদার ইত্যাদির অবসান ঘটেছে। এইসব রাজা, জমিদার শ্রেণীদের নানা দোষের মধ্যে—সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সাহায্য করা রূপ গুণাবলীও কিছু কম ছিলো না। অভিনয়, নৃত্য, গীত ও চিত্রে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা সর্বজনবিদিত। এখন সেই রাজা জমিদার ইত্যাদি বেসরকারী ব্যক্তিত্ব ও তাদের সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে এসেছে ব্যবসায়ীরা এবং তাদের প্রতিষ্ঠান-গুলি। সেদিক দিয়ে কলাকৃষ্টির ব্যাপারে এইসকল দেশীয় ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট হতাশ হওয়ার কারণ আছে, বিশেষ করে বাঙালী ব্যবসায়ী এবং তাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তো বটেই অঙ্গুলিগ্রাহ্য কয়েকজন ব্যতিরেকে খুব কম বাঙালী ব্যবসায়ী দেশের কৃষ্টি অথবা সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহান্বিত বা পৃষ্ঠপোষকতায় আগুয়ান।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতি-ষ্ঠান বার্মাশেলের এদেশের কলাকৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সাহায্যদানকারী হিসেবে সুনাম কিন্তু সর্বজন-স্বীকৃত। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হোয়েও বার্মাশেল আজ নানারকম কল্যাণকর কলাকৃষ্টির কার্যে এগিয়ে এসেছে। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'আর্ট ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্' আন্দো-লনের কৃতকার্যতা কে না জানে?

পুনরায় গত এপ্রিল মাসে এক অনাড়ম্বর অনু-ষ্ঠানের মধ্যে বার্মাশেল পক্ষ থেকে মিঃ জে. চোপরা সাংস্কৃতিক মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ন কবীরের হাতে ৩৭,৫০০ টাকা দান করেন এবং আরও ৩৭,৫০০ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক কবীর বলেন যে, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বার্মাশেলের এই দান আন্তর্জাতিক মানুষ রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীর ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ কোনো দেশকালভেদের মধ্যে নিজের আদর্শকে আবদ্ধ করেন নি। তাই আজ রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎযাপনের জন্যে দেশে দেশে বিরাট

মিঃ জে. চোপরা প্রোঃ কবীরের হাতে সাইত্রিশ হাজার পাঁচ শত টাকা দিচ্ছেন।

শৈলের অনুষ্ঠানে বাঁ দিক থেকে দাঁড়ানো : ডাঃ কলিদাস নাগ, শ্রীদিনেশ দত্ত, প্রোঃ হুমায়ুন কবীর ও শ্রী জে. চোপরা।

প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে চলেছে। কোম্পানীর পক্ষ থেকে মিঃ জে. চোপরা অধ্যাপক কবীরকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, কবির শতবার্ষিকী ভাণ্ডারে টাকা দিয়ে কোম্পানী যুগপৎ গর্ব ও আনন্দ অনুভব করছে। ভারতের জাতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী এক স্মরণীয় উৎসব বোলে তিনি মনে করেন। কবির মহৎ চিন্তাধারা ও সুমহান্ কবি প্রতিভার প্রচার ও প্রসারের জন্যেই তাঁরা এই অর্থ শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করেন।

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী উৎসব

কিছুদিন আগে বিখ্যাত বোম্বাই সহরের 'স্ট্রাণ্ড' নামক সিনেমা হলে 'ভিরাটস্' নামক সম্প্রদায়ের উদ্যোগে সত্যজিৎ রায়ের অনশ্বর ছবিগুলির সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শন-উৎসব সুসম্পন্ন হয়। কয়েকজন তরুণ কর্মো-

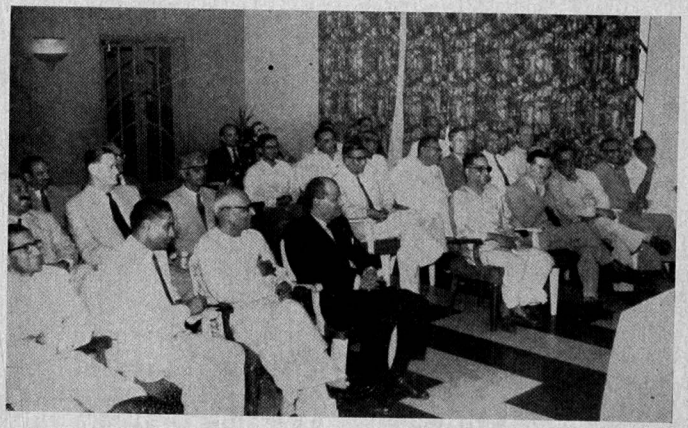

বার্ম্মাশেলের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কবি স্বর্গত সুধীন দত্ত ও অশোক সরকার প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে।

দ্যোগীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উৎস সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। কোলকাতার প্রতিনিধি সাংবাদিক আশীষতরু মুখোপাধ্যায় ও বোম্বাই নিবাসী রমেন গুহর পরিকল্পনার ও পরিশ্রমে এই উৎসব সুদূর শহরে দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং সত্যজিৎ রায় এই উৎসব উপলক্ষে বোম্বাই-এ উপস্থিত ছিলেন। শিল্প শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের 'দেবী' ছায়াচিত্র নিয়ে প্রখ্যাত অতিথি ও দর্শকদের সামনে এই উৎসবের প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে কীর্তিমান শ্রীরায়ের ভাষণটি খুবই মনোজ্ঞ হয়েছিল। প্রবাসী বাঙালী ও অন্যান্য দর্শকদের কাছে 'পথের পাঁচালী' ও 'পরশপাথর' ছবিটি অকুণ্ঠ প্রশংসা পায়।

প্রতিভা সাহিত্য মন্দির

কিছুদিন হোলো ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতির সাধনা ও

চর্চার আদর্শকে বজায় রেখে 'প্রতিভা সাহিত্য মন্দির' নামে এক সাংস্কৃতিক সংস্থা খোলা হোয়েছে। বিভিন্ন গুণী ব্যক্তিগণ তাদের উপদেশাদি দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য কোরছেন। সংস্থার বিভিন্ন কার্যকরী বিভাগের মধ্যে আছে—হাতে লেখা ও মুদ্রিত পত্রিকা, যাতে সভ্য-সভ্যা ও তরুণ লেখক-লেখিকা ও শিল্পীরাই সবার আগে সুযোগ পান। এই প্রতিষ্ঠানে পাঠাগার ও আলোচনা বিভাগও আছে। এছাড়া, নাট্যবিভাগও আছে। এই বিভাগে নতুন নাট্যকারদের নাটকই অভিনীত হয় এবং তরুণ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সমান সুযোগ দেওয়া হয়।

এই সংস্থার তরুণ সভ্যদের ব্যাবস্থাপনায় পর পর দুটি চিত্রপ্রদর্শনী হয়—সংস্থারই শিল্পীদের আঁকা ছবি নিয়ে। সংস্থার শিল্পীরা প্রদর্শনীর ঘরটিতে আলপনা এবং মৃৎশিল্পের দ্বারা সজ্জিত কোরে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করেন। এই পরিবেশে অয়েল, ওয়াটার, প্যাস্টেল, চারকোল, পেন্সিল প্রভৃতি মাধ্যমের সাহায্যে বিভিন্ন ধরণের ছবি প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন চিররঞ্জন গোস্বামী, মিনতি রায়, দীপ্তি মুখার্জি ও আরো অনেকে।

এই ধরণের প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্যে তরুণ উদ্যোক্তরা অবশ্যই ধন্যবাদভাজন। প্রত্যেক পল্লীতে যদি এভাবে ছোটো ছোটো প্রতিষ্ঠান গোড়ে শিল্প ও শিল্পীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্যোগী হয় তাহলে দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সমস্যা অনেকখানি যে সমাধান হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুন্দরম্

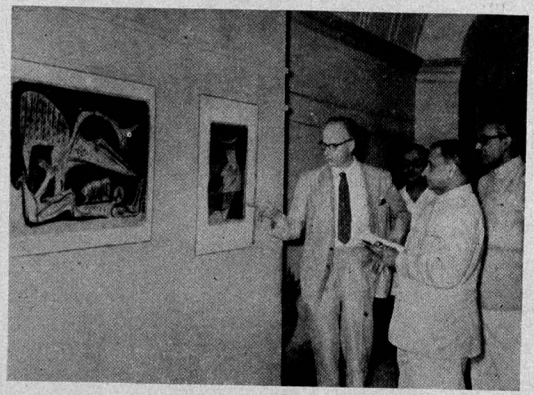

জার্মাণ চিত্রপ্রদর্শনীতে শ্রীদেশমুখ ও তাঁহার পার্শ্বে জাতীয় কলাশালার অধ্যক্ষ ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত দণ্ডায়মান।

'প্রতিভা সাহিত্য মন্দির'-এর দীর্ঘায়ু কামনা করে।

হিটলারের পর জার্মানীতে আধুনিক শিল্পকলা

গত অক্টোবর মাসে নয়াদিল্লীতে জার্মান আধুনিক শিল্পকলার এক প্রদর্শনী হোয়েছিল। এই প্রদর্শনীতে জার্মান শিল্পীদের আঁকা আধুনিক বহু রসোত্তীর্ণ ছবি ছিল। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন বিশ্ব-

জাতীয় শিল্পপ্রদর্শনীতে রাধাকৃষ্ণাণ, নেহরু, নাসের ও কবীর।

বিদ্যালয়-গ্রাণ্টস্ কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী সি. ডি. দেশমুখ।

জার্মানের শিল্প ঐতিহ্য সুপ্রাচীন ও সুসমৃদ্ধ। নয়াদিল্লীর রসজ্ঞ দর্শকরা স্বভাবতই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

হিটলারের সময় জার্মানিতে 'মডার্ণ আর্ট' সম্পূর্ণরূপে বন্ধ কোরে দেওয়া সত্ত্বেও জার্মানের আধুনিক শিল্প তার ঐতিহ্যকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে নি। আজ সে পুনরায় আগের যুগের একই প্রশংসনীয় অবস্থায় আত্মপ্রকাশে সক্ষম।

ভারতীয় জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীতে আবদুল নাসের

গত ৩০শে মার্চ তারিখে আমাদের জাতীয় শিল্প প্রদর্শনী আরম্ভ হয়। বিভিন্ন ধরণের চিত্তাকর্ষক ছবির সমারোহে প্রদর্শনীটি বেশ আকর্ষণীয় হোয়ে ছিলো। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ এস. রাধাকৃষ্ণাণ। ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের রাষ্ট্রপতি মিঃ গামেল আবদুল নাসের রাজধানীতে থাকাকালীন এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। রাষ্ট্রপতি নাসের, প্রধানমন্ত্রী নেহরু, উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণাণ এবং সংস্কৃতি মন্ত্রী হুমায়ন কবীর কয়েকটি ছবির যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

সিঙ্গাপুরের ভারতীয় কলা প্রদর্শনীর উদ্বোধনী উৎসব।

সিঙ্গাপুরে ও মালাক্কার ভারতীয় শিল্পকলা

কিছুদিন হোলো সিঙ্গাপুর আর্ট কাউন্সিলের পরিচালনায় সিঙ্গাপুর র‍্যাফেলস্ মিউজিয়ামে ভারতীয় শিল্পকলার এক প্রদর্শনীর উদ্ঘাটন হয়। শিল্প-সংস্কৃতির মাধ্যমে স্থাপিত মৈত্রীবন্ধন সচরাচর দীর্ঘদিন স্থায়ীত্বের সম্মানের অধিকারী। সিঙ্গাপুরে এই প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লি কুয়ান ইউ। প্রদর্শনীতে দিল্লীস্থ ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী এবং ন্যাশনাল একাডেমি অব আর্টের বাছাই করা ছবিগুলো প্রদর্শিত হয়। কুয়ালালামপুরে দুই মাস এবং মালাক্কাতে নয় দিন যাবত এই প্রদর্শনীটি খোলা ছিলো। সহযোগিতার জন্যে সুন্দরম্ সিঙ্গাপুর মিনিস্ট্রি অব কালচারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

দিল্লী প্রদর্শনীতে অসম স্টলের পুরস্কার প্রাপ্তি

দিল্লীর বিশ্ব কৃষি প্রদর্শনীতে গতবারে পশ্চিমবঙ্গের প্যাভিলিয়নের একটি ছবি সুন্দরম্ ছেপে ছিলো। এবারে আমাদের প্রতিবেশী অসম রাজ্যের প্যাভিলিয়নের একটি ছবি আমরা ছাপলাম। এই প্যাভিলিয়নটি মনোজ্ঞ স্থাপত্যের ও রুচিসম্মত সজ্জার দরুণ দর্শকদের কাছ থেকে বিশেষ প্রশংসা লাভ কোরেছিলো। আমরা শুনে আরও সুখী হয়েছি যে, সমগ্র প্রদর্শনীর স্টল নির্মাণের মধ্যে এটি দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ কোরছে। আমরা অসম সরকারের প্রচারবিভাগকে এইরূপ রুচিসম্পন্ন স্টলের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলার লোকশিল্পের অনুসরণে আবরণী পত্র

কিছুদিন আগে সুন্দরম্-এ ভারতীয় টী বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত চায়ের পেটিকার একটি ছবি প্রকাশিত হোয়েছিলো, কারণ ভারতীয় ঐতিহ্যে ও অলঙ্করণে সেই পেটিকাটি ছিলো সমৃদ্ধ। অধুনা আমাদের নজরে

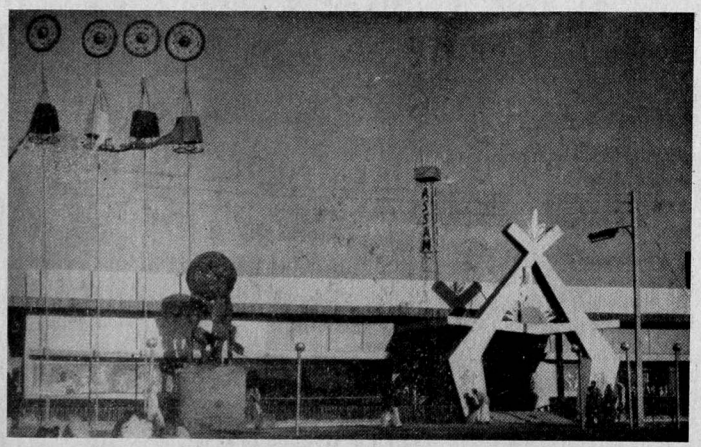

দিল্লীর বিশ্বকৃষি প্রদর্শনীতে অসম সরকারের স্টলের সম্মুখের দৃশ্য।

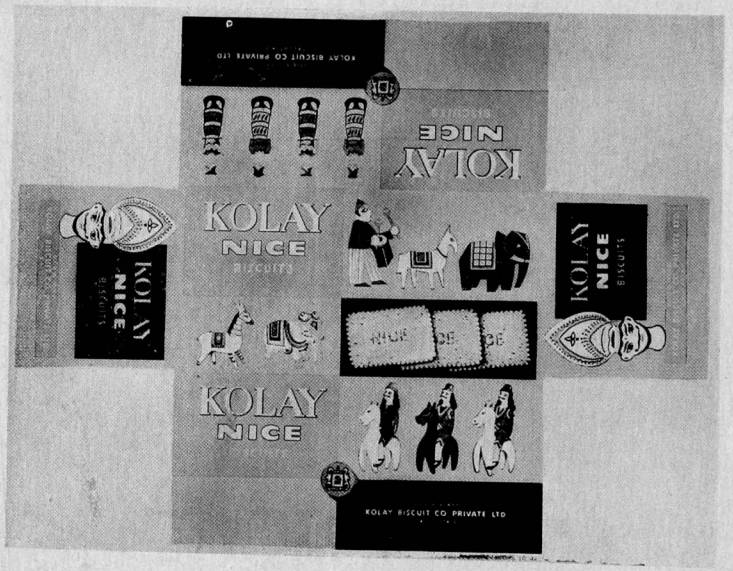

কোলে বিস্কুট কোম্পানীর বিস্কুটের টিনের বাংলার লোকশিল্পের ধারা অনুযায়ী একটি অভিনব আবরণী পত্র।

পড়েছে কোলে বিস্কুট কোম্পানীর বিস্কুটের বাক্সের একটি রঙিন আবরণী পত্র। ভারতীয় তথা বাংলার লোকশিল্পের প্রতীক নিয়ে আঁকা বহুবিচিত্র রঙীন এই আবরণীপত্রটি বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। বাঙলা দেশের বিস্কুট, চকলেট, লজেন্স ইত্যাদির কারবারে বাংলার নিজস্ব কলাজগতের এই বৈশিষ্ট্য প্রয়োগে কোলে বিস্কুট পথপ্রদর্শন কোরলেন। আমরা কোলে বিস্কুটের এইরূপ রূপসজ্জার ভূয়সী প্রশংসা করছি। —**অজিত পাইন।**

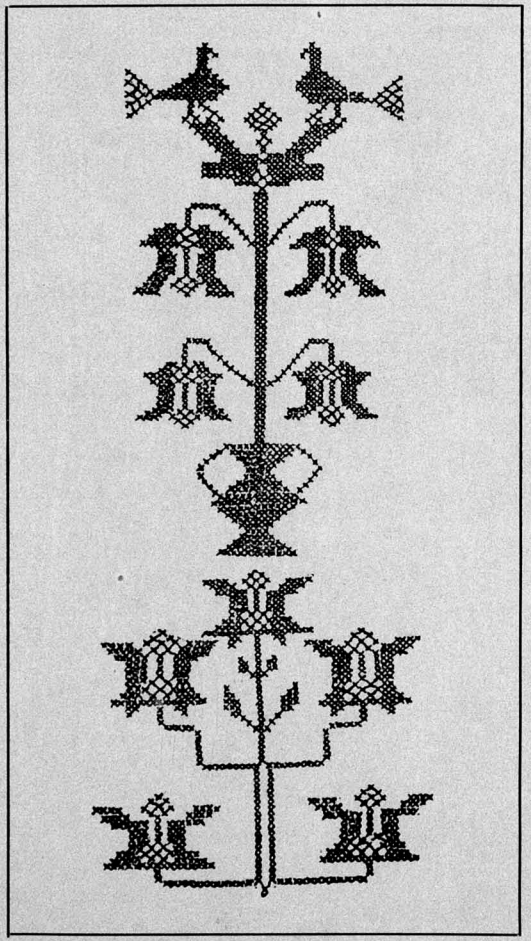

রয়েল কলেজ (গভঃ রেজিষ্টার্ড)

বর্ত্তমানে ভারতের বৃহত্তম বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্য্যালয় : ১২, পাঁচু খানসামা লেন, শিয়ালদহ, কলিকাতা-৯ : : ফোন : ৩৫-৪৮৯৪

ইহা একটি বিশ্বমান

মিস্ এমিলি ডি স্মিথ সর্টহ্যাণ্ডে প্রতি মিনিটে ২২০, ২৪০ ও ২৫০টি শব্দ লিখিয়া ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ টিচার্স সার্টিফিকেটের একমাত্র অধিকারিণী হইয়াছেন।

কমার্স বিভাগ

১, ৩ ও ৬, মাসে ইংরাজী ও হিন্দী টাইপ এবং সর্টহ্যাণ্ড শিখুন। সাফল্য সুনিশ্চিত।

ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ

এ, এম, আই, ই (ইণ্ডিয়া), মেকানিক্যাল ফোরম্যান, সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং, ওভারসিয়ার, ষ্ট্রাকচার্যাল ও মেসিনসপ ইঞ্জিনীয়ারিং, ড্রাফটসম্যান (সিভিল-মেকানিক্যাল), ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজর এবং ওয়্যারম্যান, বি, ও এ, টি, রেডিও।

ডাকযোগেও শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রসপেক্টাস—১৲ টাকা।

টিউটোরিয়াল বিভাগ

স্কুল ফাইনাল, আই-এ, আই, এস-সি, আই-কম, বি-এ, বি, এস-সি, বি-কম ছাত্রদের বিশেষ যত্নসহকারে পড়ান হয়। খড়্গপুর, শিবপুর, ধানবাদ ইঞ্জিনীয়ারিং ও বি, ও, এটিতে ভর্তি হইবার পরীক্ষার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞ অধ্যাপক দ্বারা ছোট ছোট দলে প্রস্তুত করান হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবেও নজর দেওয়া হয়। মেয়েদের জন্য ভিন্ন ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কালোচিত পরীক্ষা নিয়মিত লওয়া হয়। ইংরাজী বলা ও লেখা শিক্ষার বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। যে কোন দিন ভর্ত্তি হওয়া যাইতে পারে।

সাক্ষাৎ করুন

শাখাসমূহ :— ১। ৬।১, পাঁচু খানসামা লেন, ২। ১৬।১৭ কলেজ ষ্ট্রীট, ৩। ১০৮, সাউথ সিঁথি রোড, ৪। ৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, । ৩, আপার সারকুলার রোড, ৬। ষ্টেশন রোড, হাবড়া। ৭। ৬৭, নেতাজী সুভাষ রোড, বেহালা (বাজারের পাশে)

বাংলার ও বস্ত্র শিল্পের লক্ষ্মী

বঙ্গলক্ষ্মী

মাতৃপূজায় ও নিত্য প্রয়োজনে

বঙ্গলক্ষ্মীর

ধুতি, লংক্লথ, শাড়ী

অপরিহার্য্য

ভারতের প্রাচীনতম গৌরবময় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

হেড অফিস : ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

With Compliments of :

THE BEHAR FIREBRICKS & POTTERIES LTD.

Manufacturers & Exporters of

QUALITY FIRECLAY & SILICA REFRACTORIES
FOR NEARLY HALF A CENTURY

Works :

MUGMA P. O.
E. RLY.
DT. DHANBAD

Gram : "FIREBRICKS" MUGMA.
Phone : BARAKAR 41.

Head Office :

22, STRAND ROAD,
CALCUTTA - 1

Gram : "BANCO" CALCUTTA.
Phone : 22-5952, 22-3101

KULJIANS HELP BRING MORE POWER TO THE GRID

An ultimate installed capacity of 200,000 KW at the newly set-up Thermal Power Plant at Durgapur and another of 600,000 KW, the biggest ever planned in the East, at the Thermal Power Plant proposed at Bandel, will bring tremendous power to the national Grid. The Kuljian Corporation have been appointed as technical consultants for both these projects of the West Bengal Government.

In India, the Kuljian Corporation operate a fully equipped design and engineering office, offering specialised service and 'know-how' on every aspect of planning, engineering, construction and initial operation. With highly qualified Indian and foreign experts and sustained by Kuljian's diversified experience, the Corporation practise the famous 'Kuljian Method' which has been successfully tested on five Continents in power projects—steam, internal combustion and hydro-electric.

Also consultants in India for :

- Bokaro Thermal Power Station, D.V.C.
- Durgapur Thermal Power Station, D.V.C.
- Bokaro 4th Unit Extension, D.V.C.
- 'C' Station, Delhi Electric Supply Undertaking
- Barauni Thermal Power Station, Govt. of Bihar
- Cambay Thermal Power Station, Govt. of Gujarat

The **Kuljian** *Corporation*

engineers • constructors

1200 NORTH BROAD STREET, PHILADELPHIA, U.S.A.
India Office : 7, Chittaranjan Avenue, Calcutta-13
Design • Engineering • Procurement • Construction • Reports • Initial Operation

the steel tube age

The production of the Indian Tube Company is used for an astonishing and ever-widening variety of purposes.

Indian Tube

The Indian Tube Co. (1953) Ltd.
A TATA-STEWARTS AND LLOYDS ENTERPRISE

যত্ন করে টিকেট লাগান
এবং
ডাক চলাচলে বিলম্ব কমান

* **উপযুক্ত মূল্যের টিকেট লাগান**
চিঠিপত্রে যদি উপযুক্ত মূল্যের টিকেট অথবা কোন টিকেট না থাকে তাহলে বাছাই করার সময় সেগুলির হিসেব রাখার জন্য আলাদা করে রাখা হয়, ফলে সেগুলির পৌঁছুতে দেরী হয়।

* **চিঠিপত্রের যেদিকে ঠিকানা লেখা হয় সেখানে ডান দিকের উপরের কোণে টিকেট লাগান**
এতে বাছাই করতে সময় কম লাগে, তাছাড়া টিকেট কাটার স্বয়ংচালিত যন্ত্রেও তাড়াতাড়ি কাজ হয়।

* **প্রয়োজনীয় মূল্যের যথাসম্ভব কম টিকেট ব্যবহার করুন**
এর ফলে সম্পূর্ণ ঠিকানা লেখার জন্য যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায় এবং টিকেটও তাড়াতাড়ি কাটা যায়।

* **আলগাভাবে টিকেট লাগাবেন না**
কারণ টিকেট যদি প'ড়ে যায় তাহলে চিঠিতে টিকেট লাগানো হয়নি বা কম লাগানো হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। ফলে চিঠি পৌঁছুতেও দেরী হতে পারে।

আপনাদের আরও সেবা করতে
আমাদের সাহায্য করুন

ডাক ও তার বিভাগ

উপযুক্ত মূল্যের অথবা সঠিক টিকেট না লাগালে সেই জিনিষটি পৌঁছুতেই শুধু দেরী হয়না, সমস্ত ডাক ব্যবস্থাতেই অন্তরায়ের সৃষ্টি করে।

যত্ন করে টিকেট লাগান

DA 59/356

দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল সাবধান

যাপন করুন

তাঁতের কাপড় যাঁরা ব্যবহার করেন গরম বা আর্দ্রতাকে তাঁরা ভয় পান না। বাড়ীতে, কাজের জায়গায় অথবা ছুটিতে, কোমল, বাতাসের মতো হালকা, উজ্জ্বল ও আরামদায়ক তাঁতের কাপড়, শীতলতার পরশ এনে গরমকে দূরে রাখে।

হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রী

আরামদায়ক • সুন্দর • বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

অখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত বোর্ড

পোষ্টব্যাগ নং ১০০৪, বোম্বাই-১

DA 60/34

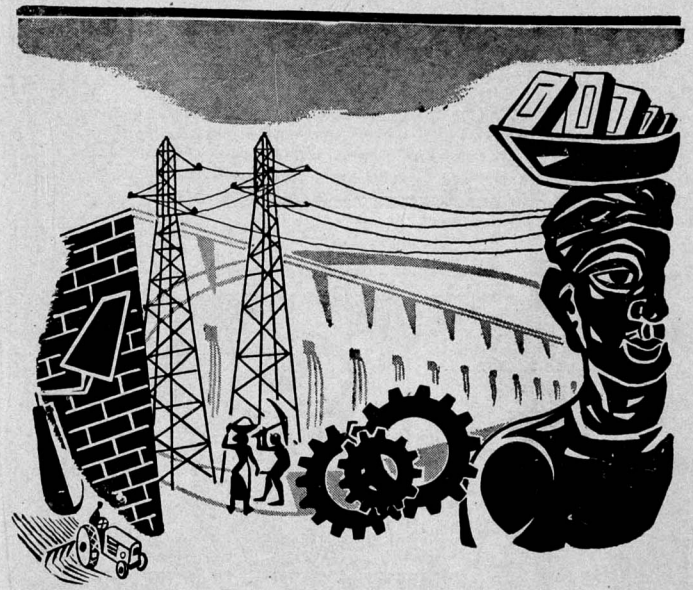

পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিম বঙ্গ

উন্নয়ন খাত	প্রথম পরিকল্পনায় বিনিয়োগ	পরিকল্পনায় ব্যয় (কোটি টাকার হিসাব)	দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগ
কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন	৮·৫	৮·৪	৩৪·৪
জলসেচ ও বিদ্যুৎ	১৫·৮	১৩·৫	৩০·৭
শিল্প	১·১৪	১·১৫	১০·০
যানবাহন ও যোগাযোগ	১৫·৫	১৫·১০	১৯·৫
সমাজ সেবা	৩১·৩	২৯·৪	৫৩·৯
বিবিধ	...	...	৯·২
	৭২·২৪	৬৭·৫৫	১,৫৭·৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

উত্তর প্রদেশের সংস্কৃতির চার হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় ভারতীয় আর্যসভ্যতার যুগে। পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শিল্প ও সংস্কৃতিতে এক নতুন ধারার সুরু হ'ল। বাদশাহী আমলের জাঁকজমক ও শিল্পবোধ অমর হ'য়ে রইল মোগল স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের মধ্যে। বিরাট কল্পনা ও সূক্ষ্মতম কারিগরীর অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে মোগল স্থাপত্যে—কালজয়ী এই সব সৃষ্টি আজও সারা পৃথিবীর বিস্ময় জাগায়।

ভারতবর্ষের যেখানেই যান, লাল পাথরে গড়া ফতেপুর সিক্রীর নিস্তব্ধতা থেকে তাজমহলের অকলঙ্ক শুভ্রতা পর্যন্ত সর্বত্রই আপনার স্মরণীয় মুহূর্তগুলোকে আরও উপভোগ্য ক'রে তুলবে উইল্‌স-এর গোল্ড ফ্লেক সিগারেটের অতুলনীয় স্বাদগন্ধ।

গোল্ড ফ্লেকের চেয়ে

ভালো সিগারেট কোথায় পাবেন

৫০ টার দাম ৪ টাকা • ২০ টার দাম ১ টাঃ ৬০ নঃ পঃ • ১০ টার দাম ৮০ নঃ পঃ

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

GF/559

দিনকাল খারাপ। আয় থেকে কিছু যে বাঁচাবেন, তার উপায় নেই। সংসার বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়টাও মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তাই আপনার বংশধরদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য এখন থেকেই সামান্য কিছু সঞ্চয় করতে সুরু করুন না কেন! আপনার আয় যেমন বাড়বে আপনার সঞ্চয়ও সেই সঙ্গে বেড়ে চ'ল্‌বে।

ওদের চোখের আলো অম্লান রাখুন....

জীবন বীমা এজেন্টের কাছে খোঁজ নিন, তিনিই আপনাকে ব'লে দেবেন, কী ধরনের পলিসি আপনার প্রয়োজন।

লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া

LIC-CB2

উৎসবে আনন্দে
জাতির তৈরী সেরা অকৃত্রিম
বাংলার রেশম
ব্যবহার করুন

পশ্চিম বঙ্গ রেশম শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিমিটেড্

(খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক প্রমাণিত।)

বিভিন্ন প্রকার রেশম, খাদি ও অন্যান্য গ্রামশিল্প জাত দ্রব্য যথা :— ঘানির তেল, নারিকেল ছোবড়া জাত দ্রব্য ও নানা উপহার সামগ্রী এখানে পাওয়া যায়।

বিক্রয় কেন্দ্র :—

- ১২।১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১
- কুটীর শিল্প বিপনি—১১এ, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা—১
- ১৫৯।১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯
- ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

RALEIGH RUDGE HUMBER ROBINHOOD
MONARCHS OF THE ROAD
SEN-RALEIGH INDUSTRIES OF INDIA LIMITED, CALCUTTA
SRC-62

With the Compliments
of

AIRWAYS (INDIA) LIMITED.

AERONAUTICAL SERVICES LIMITED
AIR SURVEY CO. OF INDIA PRIVATE LIMITED
31, CHITTARANJAN AVENUE,
CALCUTTA - 12

প্রাচীন ভারতে 'আশ্রম' একটি পবিত্র স্থান হিসাবে গণ্য হত এবং এর শিক্ষক ও আচার্য্যগণের স্থান যে কোন শক্তিশালী নৃপতিরও উর্দ্ধে ছিল। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা শিক্ষাকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন কারণ তারা জানতেন যে শিক্ষা ও সাধনার মাধ্যমেই মানুষের স্বাভাবিক প্রতিভা বিকশিত হয়। স্ট্যান্‌ভ্যাকের ট্রেনিং প্রোগ্রাম সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত। এই ট্রেনিং প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হল স্ট্যান্‌ভ্যাকের সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের কার্য্যদক্ষতা বাড়ান।

১৯৫৯ শালে স্ট্যান্‌ভ্যাকের প্রতিষ্ঠানটি ৪৮৫০০ ম্যান-আওয়ারস এরও বেশী খরচ করেছে তিরিশটি বিভিন্ন বিষয়ে কর্ম্মচারীদের শিক্ষা প্রদানের জন্যে। ঐ বিষয়গুলি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে মার্কেটিং এবং টেকনিকাল সংক্রান্ত বিষয়ে রিফাইনিং এবং এক্সপ্লোরেশন পর্য্যন্ত। আঠারজন কর্ম্মচারীকে গতবছর বিশেষ এবং উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশে পাঠান হয়েছিল। বাইশজন স্ট্যান্‌ভ্যাক কর্ম্মচারীকে উচ্চশিক্ষার জন্যে কম্পানীর তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছিল।

স্ট্যান্‌ভ্যাকের এই ব্যাপক ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুধু কর্ম্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের পক্ষে যা একান্ত প্রয়োজনীয়—বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে স্ট্যান্‌ভ্যাক নিজেদের প্রতিষ্ঠানের বাইরেও এই শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ১৯৫৯ শালে স্ট্যান্‌ভ্যাক সরকারী কিংবা সরকার অনুমোদিত চল্লিশজনকে ঐরূপ শিক্ষা দেয়।

স্ট্যান্‌ভ্যাক — দেশের অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করছে

স্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত. কোম্পানীর সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ

PSSVOC-108/60-BEN

আপনার নিত্য প্রয়োজনে

দীপ্তি লণ্ঠন—এর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর কম কেরোসিন খরচ। "দীপ্তি" মার্কা জিনিষের পেছনে আছে বহুদিনের অভিজ্ঞতা, সুনাম আর ক্রেতার প্রতি অকৃত্রিম সেবার মনোভাব।

জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ। এই কেরোসিন স্টোভ ব্যবহারে কোন ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে সুন্দর, কাজে চমৎকার, খরচে সামান্য। অল্প সময়ে যে কোন রান্না করা যায়।

- ধুলো, নোংরা, ঝুল বা কালীর কোন বালাই নেই।
- কম কেরোসিন খরচ, ব্যবহারে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।
- পলতে সব সময় পাওয়া যায়।

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পেটেণ্ট নং ৬২৩৫৪

KALPANA.BN

তুলি ও রংয়ের শ্রেষ্ঠ বিপনি

জি, সি, লাহা প্রাইভেট লিঃ

১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা - ১৩

ফোন ঃ ২৩-৩৮-৩৮ গ্রাম ঃ জিসিল

এক একটি সূর্য্য-কণা তুলে নিয়ে বুকে,
দুরাশার তুরঙ্গে সওয়ার
দুর্গম যুগান্ত-মরু পার হবে বলে,
তারা সব হয়েছে বাহির।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

কফি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

CB-55

DPC-99 BEN

towards a better future

Wherever Indian Aluminium Company has extended its production operations—from Bengal to Kerala, from Kerala to Bihar, from Bihar to Bombay—it has continuously sought to provide a better future for all its employees, and for its customers everywhere, in the shape of better products for a variety of new applications.

And now the industry has moved to Orissa, installing at Hirakud a new smelter which has more than doubled the country's production of aluminium. As in other phases of India's national effort, this smelter is dedicated to an era of plenty and a better future for all.

Indian Aluminium Company Limited

A Canadian-Indian Enterprise

IAP 2045

সমৃদ্ধ
সংস্কৃতির
বাহন...

তাঁতীর মাকু আর টাকু বহু ইতিহাস পেরিয়ে আজও অম্লান। আজকের যন্ত্র-শিল্প তার বয়ন সৌকর্যে নগর-জীবনকে যেমন মুগ্ধ করেছে, তাঁতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য তেমনই গৌরবান্বিত করেছে তাকে। প্রাচীন ও নবীনের টানাপোড়েনে সমৃদ্ধ বয়ন শিল্পের আভিজাত্যে এ দেশের মানুষকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলার দায়িত্ব রেলপথই বহন করে চলেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

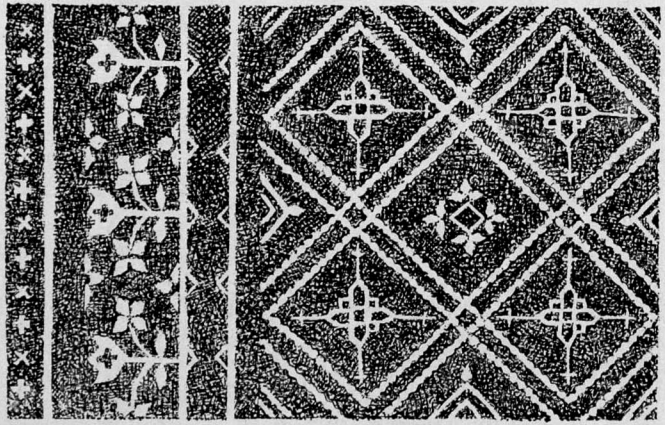

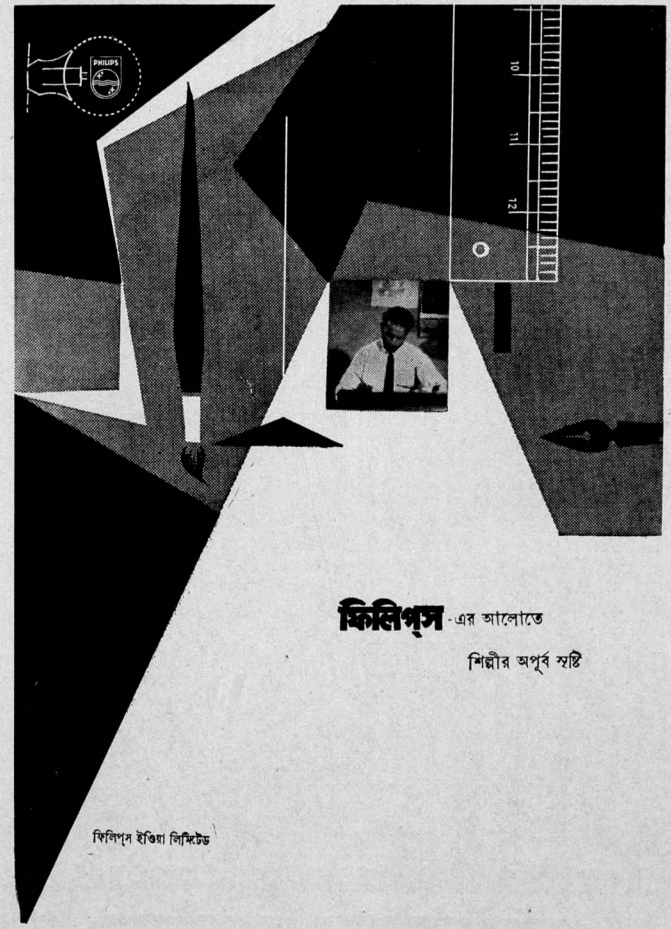

ফিলিপ্স-এর আলোতে
শিল্পীর অপূর্ব সৃষ্টি

ফিলিপ্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

'ENGLISH ELECTRIC'

EQUIPMENT FOR THE STEEL INDUSTRY

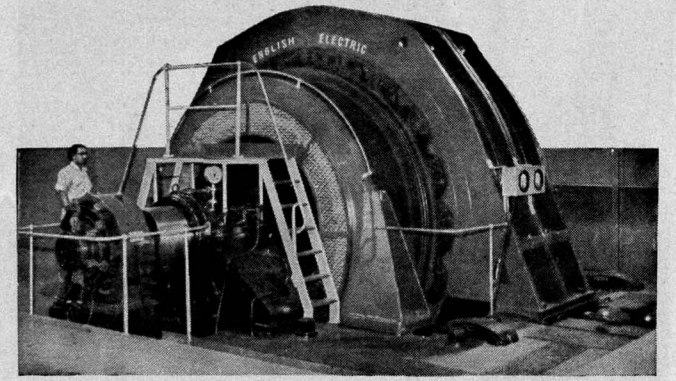

The illustration shows the 6650 H.P. Motor for the 40" Blooming Mill at the Indian Iron & Steel Works, Burnpur. In addition, the Company has supplied over 100 motors of various ratings to these Works.

For the Steel Plant at Durgapur, the Company is supplying rolling mill drives, switchgear, transformers and various types of fusegear.

THE ENGLISH ELECTRIC COMPANY LIMITED

(Incorporated in England. Liability of Members Limited)

New Delhi Calcutta Bombay Lucknow

'English Electric' high rupturing capacity switch and fuse distribution equipment is now being manufactured at the Madras Works of The English Electric Company of India (Private) Ltd.

ESC-41C

বহুদিন পূর্ব্বে ভারতের অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞরা শূণ্যকে ব্যবহার করার কথা ভেবেছিলেন। এর থেকেই সংখ্যা ব্যবহারের শুরু, গণনা শাস্ত্রের একটি আমূল পরিবর্তন। বেঁচে থেকেতে হলে মানুষকে গুণতে, ওজন করতে এবং মাপতে হবেই। সরকারের বাজেট তৈরী, ব্যবসায়ীর লাভ বা ক্ষতির আর ব্যক্তি মাত্রেই আয় ব্যয়ের হিসেব—এইসব অবশ্য-কর্ত্তব্য ব্যাপারই করা হয় সংখ্যা দিয়ে—যেটি শূণ্যের ওপর নির্ভর করে। সংখ্যার সাহায্য ছাড়া দেশব্যাপী বা বিশ্বব্যাপী ব্যবসা বা অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা অসম্ভব না হলেও শক্ত হবে। এই সংখার ব্যবহারের ফলেই আমরা জানতে পারছি যে ট্যাক্স বাদে

স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম এর ১৯৫৯ শনের মার্কেটিং ও রিফাইনিং অপারেশনে লাভ হয়েছিল ১২০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ আমাদের ব্যবসার মূলধনের ওপর শতকরা ৩ টাকা হিসাবে, এবং স্ট্যানভ্যাক ট্যাক্স ও ডিউটি হিসাবে দিয়েছে ২৬৮৭ লক্ষ টাকা—যা স্ট্যানভ্যাকের নেট আয়ের বাইশগুণ; স্ট্যানভ্যাক প্রতি গ্যালন তেল বিক্রীর উপর লাভ করে ১.৪ নয়া পয়সা মাত্র। আবার সেই সংখ্যারই দৌলতে—যা শূনোর উপর নির্ভর করছে—আমরা জানতে পারছি স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম গত বছরে ৮৯ লক্ষ টাকা তাঁদের মার্কেটিং অপারেশনের জন্যে নতুন যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে খরচা করেছে; ১০২ লক্ষ টাকা রিফাইনিং অপারেশনের জন্যে এবং ১০৬ লক্ষ টাকা পশ্চিম বঙ্গে তেলের খোঁজ করার জন্যে ব্যয় করেছে।

স্ট্যানভ্যাক—*দেশের অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করছে*

স্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত, কোম্পানীর সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ

PSSVOC-98/60

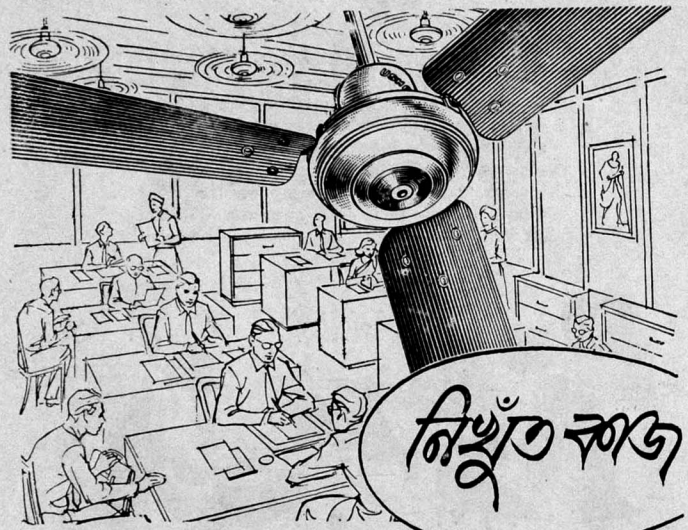

আধুনিক চেহারা ও আধুনিক গড়নের উষা ডি-ল্যুক্স ফ্যান দীর্ঘদিন ধরে নির্ঝঞ্ঝাট কাজ দেবে। ডি-ল্যুক্স মডেলের সুদৃশ্য চেহারা আধুনিক গৃহসজ্জার সঙ্গে চমৎকার মানাবে।

• বেক্‌ড এনামেল ফিনিশ—দীর্ঘদিন চক্‌চকে থাকে • ডাব্‌ল বল-বেয়ারিং লাগানো ব'লে নিঃশব্দে ঘোরে আর কাজও দেয় অনেকদিন • অল্প বিদ্যুৎখরচে অনেক বেশী হাওয়া হয় • ৬০", ৫৬", ৪৮" ও ৩৬" মাপে এ. সি.-তে পাওয়া যায়

এই সমস্ত আকর্ষণীয় গুণের জন্যই সারা পৃথিবীর ৪০ টিরও বেশী দেশের লোক আজকাল উষা ফ্যান কিনছেন।

JE-31-BEN

আজই আপনার স্থানীয়
উষা বিক্রেতার সঙ্গে
দেখা করুন।

উষা
বাজারের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্যান

জয় এঞ্জিনিয়ারিং ওঅর্কস লিমিটেড,- কলিকাতা-৩১

প্রকাশক ও মুদ্রক : সুভো ঠাকুর। এগারো, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কোলকাতা—তেরো। মুদ্রণ : লালচাঁদ রায় এন্ড কোং। সাত-এর এক, গ্রান্ট লেন, কোলকাতা—বারো।

উৎকৃষ্ট
বার্লি
বলিতেই
লিলি

সম্পূর্ন বিশুদ্ধ, টাট্‌কা
ও স্বাস্থ্যপ্রদ

সকল বয়সে ও ঋতুতে সমান উপযোগী

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪